দেশ কাল মানুষের
নাগরিক
আজ কাল পরশু

প্রথম বর্ষ ●১১ তম সংখ্যা ●২৬ আগস্ট ২০২৪

ভিতরের পাতায়

- ‘আমরা সুবিচার চাই’ - ২
- মেয়েদের লড়াই করেই বাঁচতে হবে .... বহুদিন - ৩
- এই লড়াইয়ের নেতৃত্বে আমার মা আমার বোন - ৩
- স্বাধীনতাহীনতার গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকবে মেয়েরা? - ৫
- অন্য চোখে কাশ্মীর - ৬
- কাশ্মীর কী বলছে, শোনো - ৮
- নাগরিক স্মৃতিচারণা ঃ
  অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার - ১০
- বাংলাদেশের রাজনীতি ঃ অস্থিরতা ও
  অভ্যুত্থান অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ - ১২
- বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থান কি গণতন্ত্র
  ধর্মনিরপেক্ষতার পথ সুগম করবে - ১৫
- বাংলাদেশ ঃ ৩২ নম্বরের বাড়ি
  ইতিহাসের অগ্নিদগ্ধ স্মারক - ১৭
- বাংলাদেশ ঃ সারা দেশে দেড় হাজার ভাস্কর্য ও
  ম্যুরাল ভাঙচুর - ১৮
- স্মরণ ঃ ‘চোখ’-এর স্রষ্টা উৎপলেন্দু চক্রবর্তী প্রয়াত - ২০
- হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ রিপোর্ট ঃ সেবি ও আদানিদের
  আর্থিক জালিয়াতি - ২১
- প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে বাংলাদেশে বন্যা
  ভারত কে দায়ী করে চলছে মিথ্যা প্রচার - ২৩

সম্পাদক

শান্তনু দত্তচৌধুরী

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই মেইল : nagorik0240@gmail.com

ফোন : 80178 04019 / 94340 22512

‘আমরা সুবিচার চাই’

বিগত ৯ অগাস্ট ভোর রাতে কলকাতা আর জি কর মেডিকেল কলেজে ডাক্তারির এক পোস্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রীকে খুনের ঘটনায় কলকাতা সহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ এবং সমগ্র দেশের চিকিৎসক, ছাত্র , শিক্ষক এবং অন্যান্য পেশায় যুক্ত মানুষেরা সমবেত কণ্ঠে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই বীভৎস খুনের ঘটনায় সকলে শিহরিত এবং বিবেকের দংশনে দগ্ধ।

প্রত্যহ পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা সহ বিভিন্ন শহরে মফস্বলে গ্রামে গঞ্জে প্রতিবাদী মিছিলে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমবেত কণ্ঠে, ধ্বনিত হচ্ছে " We want justice."

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সহ তিনজনের বেঞ্চ আর জি করের ওই চিকিৎসক ছাত্রীর ধর্ষণের এবং হত্যার ঘটনায় , পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে প্রশাসনিক ব্যর্থতা, বিবেকহীন আচরণ এবং নীতিহীনতার কারণে তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন। আর জি করের ওই চিকিৎসক ছাত্রীর মৃত্যুর পর , তাঁর পিতা মাতার সঙ্গে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অভব্য আচরণ ক্ষমার অযোগ্য। ময়নাতদন্তের আগেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ , মৃত চিকিৎসক ছাত্রী আত্মহত্যা করেছেন বলে তাঁর অভিভাবকদের জানানো হয়।। মৃত্যুর অটোপসি রিপোর্টের তিন ঘন্টার মধ্যেও কেন এফ -আই -আর দাখিল করা হলো না, প্রশ্ন তুলেছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা। আর জি করের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দেওয়ার পরও কেন তাকে পুনর্বহাল করা হলো অপর একটি সমমর্যাদার মেডিকেল কলেজে ? ১৪ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের রাত্রিতে আর জি কর কলেজের ভিতর যে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটলো পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ কি তার দায়িত্ব এড়াতে পারে? এই প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চে। আর জি কর মেডিকেল কলেজের সুরক্ষার দায়িত্বভার তুলে দেওয়া হয়েছে আধা সেনাবাহিনীর হাতে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রশাসনিক ব্যর্থতা কোন পর্যায়ে পৌঁছলে ১৩৮ বছরের ঐতিহ্য সম্পন্ন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বভার তুলে দেওয়া হতে পারে আধা সেনাবাহিনীর উপর।

সর্বোপরি এই ঘটনার দ্রুত নিষ্পত্তি এবং সমগ্র দেশের হাসপাতাল গুলির সুরক্ষার স্বার্থে সুপ্রিম কোর্ট কতকগুলি নির্দেশ জারি করেছে। সিবিআইয়ের রিপোর্ট জমা দেওয়ার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। আর জি করের ঘটনা ঘটার পর ১২ দিন অতিক্রান্ত, এখনো অবধি সিবিআই -- এর তদন্ত কতদূর এগিয়েছে তার কোনও খবর নেই। সময়সীমা বেধে দেওয়া, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের , সি বি আই এর কাজের অগ্রগতি সম্পর্কিত দুশ্চিন্তারই বহিঃপ্রকাশ। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আমাদের দেশের সমস্ত মেডিকেল কলেজের সুরক্ষা সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে একটি সর্ব ভারতীয় টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। এক মাসের মধ্যে সমস্ত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে কলেজের নিরাপত্তা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর জি কর হাসপাতালের মধ্যে ১৪ ই আগস্ট রাত্রিতে যে ভাঙচুর সংঘটিত হয়েছে তারও রিপোর্ট নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তলব করা হয়েছে।এই সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকদের সংশয়ের অবসান ঘটেনি। কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ এবং আর জি কর মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের তদন্তের অভিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার বেপরোয়া এবং নির্লজ্জ মনোভাব।

সিবিআই এর তদন্তে গতি আনার জন্য প্রয়োজন তথ্য প্রমাণ এবং রাজ্য সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা। রাজ্য সরকারের বিগত কয়েক দিনের আচরণে সিবিআইকে সহযোগিতার করার বিষয়টির থেকেও, আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ কে সুরক্ষা দেবার বিষয়টি অগ্রাধিকার পাচ্ছে। আর জি কর মেডিকেল কলেজের সুরক্ষার পরিবর্তে আর জি করের অধ্যক্ষের সুরক্ষার প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনেক বেশি দায়বদ্ধ বলে সরকারের আচরণে প্রকাশ পাচ্ছে।

মহিলাদের সুরক্ষার জন্য সুপ্রিম কোর্টের নিয়মবিধি এবং আন্তরিক উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েও বলা যেতে পারে সরকারি প্রশাসন যতদিন না দুর্নীতি মুক্ত হচ্ছে, সুপ্রিম কোর্টের উদ্যোগের সফলতা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ থেকে যাবে।

গত সংখ্যার ২৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত
‘বিজেপি’র ঘোলা জলে মৎস্য স্বীকার’ লেখাটির শুদ্ধ
বানান হবে ‘মৎস্য শিকার।’
এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

মেয়েদের লড়াই করেই বাঁচতে হবে...বহুদিন

প্রতিভা সরকার

যে পার্কে সন্ধে বেলায় হাঁটতে যাই, সেখানে যেতে আমার প্রায়শই দেরি হয়ে যায়। পড়াশুনো, গেরস্থালির কাজকাম সেরে তবে না যাওয়া !

কিন্তু একথা মানতেই হবে পার্কের চক্কর আমাকে মানব চরিত্র বুঝতে শেখায়, অনেক কথা কানে ভেসে আসে, সেখানে বাবা রামদেব থেকে মেয়েদের পোশাকআশাক সবই আছে। আর আছে প্রেমিকযুগলদের বিচিত্র ব্যবহার। প্রেমময় ছেলেটি প্রকাশ্যে মেয়েটির বিনুনি বেঁধে দিচ্ছে এও যেমন দেখেছি, তেমনি আজ শুনেছি সেই মর্মান্তিক বাক্য, 'এইজন্য তো আরজিকর কেস হয় !'

মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'কী জন্য হয় রে ? যেজন্যই হোক, তোকে আমি আর টলারেট করব না।' মেয়েটি হনহনিয়ে বাইরে চলে গেল, ছেলেটি অধোমুখে বেঞ্চে বসে রইল।

আমি তো জানি না ওদের কী নিয়ে মনোমালিন্য, কিন্তু ছেলেটি অনায়াসে যে কথা উচ্চারণ করল, তার অর্থ কি ও জানে ? একটা আরজিকর আরও একশটা মেয়ের মনোবল ভেঙে দেয়, যে আশায় বুক বেঁধে এগিয়ে যাচ্ছিল, তাতে ছাই ঢেলে দেয়। পারিবারিক বাধাগুলোকে আরও শতগুণ বাড়িয়ে তোলে, ঐ তো শুনলে ওর কথা, আর তোমার ক্লাস করে ফিরতে এত রাত হলে ক্লাসে গিয়েই কাজ নেই। একটা ধর্ষণ মানে এক ধাক্কায় মেয়েদের কয়েকশ' যোজন পিছিয়ে দেওয়া, একটা ধর্ষণ করে খুন মানে এমন ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি করা যে প্রশ্ন উঠে যায় কেন মেয়ে হয়ে জন্মালাম। কোচবিহার থেকে একটি মেয়ে আমাকে লিখেছে, আগে কন্যাভ্রূণ হত্যা হত, তাইই ভালো ছিল, এখন বাঁচিয়ে রেখে তিলে তিলে মেরে ফেলবার ব্যবস্থা পাকা।

আচ্ছা, কোনও মেয়ের যদি ক্যারাটে শিখতে দুচ্ছাই লাগে, তার ইচ্ছে গুরুগ্রামে থেকে মোহিনীআট্যম শিখবে, তাহলেও তাকে ক্যারাটে শিখতেই হবে ? রাষ্ট্র নিরাপত্তা দিতে পারছে না বলে তাকে অন্তরের ভালো-লাগাগুলো বাদ দিয়ে হিংস্রতা শিখতে হবে ! মানুষের বেসিক নেচার পালটে দেবার চেষ্টা অনবরত চলতে থাকলে মানুষ কি আর ভালো মানুষ হয়ে উঠতে পারে !

ছেলেদের শেখাও, মায়েদের প্রতি এই উপদেশ ক্ষণে ক্ষণে বর্ষিত হতে দেখি। শেখানো কি শুধু মায়েদের একার ওপর নির্ভর করে ! মহিলা কমিশনের শুনানি চলাকালিন দেখিনি কি বাবার কথায় অকাতরে সায় দিয়ে মা-কে সম্পূর্ণ দোষী সাজাচ্ছে ছেলে, আর মা তারস্বরে চেঁচাচ্ছেন, 'ওকে ঘুষ দিয়ে ওর বাবা কিনে নিয়েছে। আজ এখানে আসবে বলে পরশু ওর হাতের ওই দামী মোবাইলটা কিনে দিয়েছে।'
বড় মানুষরাই এক বোতল দামি স্কচ বা একটি দামি ল্যাপটপের লোভ ছাড়তে পারে না, আর একটা বাচ্চা ছেলে !

জীবন বড় জটিল। এখানে দুইয়ে দুইয়ে কখনই চার হয় না। কোনও ফরমূলা নেই যে এ পথে চললে মেয়ে সম্পূর্ণ নিরাপদ। তবে প্রগতি সবসময়ই সামূহিক বা কালেক্টিভ। আগে মেয়েদের যে অবস্থা ছিল, তার থেকে এখন একটু হলেও ভালো, এর পেছনে আমাদের পূর্বজ পূর্বজাদের লড়াই। লড়াইয়ের ময়দান ছাড়লে চলবে না। পরের প্রজন্মের পথ যতটা পারি নিষ্কন্টক করার জন্য আমাদেরই দায়ভাগ নিতে হবে। তলড়াই লড়াই লড়াই চাই/ লড়াই করে বাঁচতে চাইদ ক্লিশে এই শ্লোগানটার বাস্তবতা এখনও ফুরোয়নি যে !

এই লড়াইয়ের নেতৃত্বে আমার মা আমার বোন

প্রসেনজিৎ দত্ত

---

৯ আগস্ট ভোর রাত, নজিরবিহীন নৃশংসতা বাংলার মাটিতে।শুধু বাংলা বললে ভুল হবে,গোটা দেশ মাথা নত করেছে লজ্জায়।কলকাতার আর.জি.কর হাসপাতালে স্নাতকোত্তর পাঠরতা চিকিৎসক সেদিনও মানুষের প্রাণ বাঁচানোর লড়াই - এ ছিলেন সামিল,টানা ৩৬ ঘণ্টা তাঁর কর্তব্য রক্ষার লড়াই - এর পর সাময়িক বিশ্রামে গেছিলেন, নিজেরই কর্মস্থলের অভ্যন্তরে।নিজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।সেখানেই তাঁকে যেতে হলো চির বিশ্রামে।যেতে হলো বলাটা বোধহয় ভুল হলো,সে দিন নর খাদক/ নরখাদকেরা খুবলে খুবলে খেয়ে চিকিৎসক মেয়েটার নিষ্প্রাণ দেহ ফেলে রেখেছিল তাঁর সেদিনের বিশ্রাম কক্ষ আর.জি.কর হাসপাতালের সেমিনার হলে।

সে দিন ছিল প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের শেষ যাত্রা।অগণিত মানুষের শেষ শ্রদ্ধা জানানোর ছবি ভেসে আসছিল টিভির পর্দায়।হঠাৎই নিউজ ব্রেকিং - আর.জি.কর হাসপাতালে একজন পি.জি.টি শিক্ষার্থীর অস্বাভাবিক মৃত্যু।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একে একে যে খবর গুলি পেতে থাকলাম আমরা তা বিভৎসতাকেও হার মানায়।হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ থেকে পুলিশ প্রশাসনের অস্বাভাবিক আচরণ ও

প্রকৃত ঘটনা আড়াল করার চেষ্টা থেকেই সূচনা হয় ক্ষোভের। প্রথমে সহপাঠী,জুনিয়র ডাক্তার থেকে সাধারণ মানুষ,ক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র।মৃতার পরিবারকে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে ভুল তথ্য দেওয়া,তড়িঘড়ি নিয়ম বহির্ভূত ভাবে দেহ ময়না তদন্ত করানো,পরিবারের সদস্যদের মতামত না নিয়েই দেহ দাহ করার ব্যস্ততা,সমস্ত কার্যকলাপ সাধারণের মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্নের জন্ম দেয়।ইতিমধ্যে ময়না তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট সম্পর্কে জানা যায় যে খুন হয়েছে মেয়েটি। শুধুমাত্র খুন নয়,খুনের আগে তাঁকে ধর্ষণ করা হয়েছে।সারা শরীরে অত্যাচারের চিহ্ন। বিভৎসতা চরম বিভৎসতা একজন সেবা রত চিকিৎসকের উপর।

এর পরের ঘটনা আরও উদ্বেগের। এই ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্তদের যত শীঘ্রসম্ভব চিহ্নিত করে শাস্তির ব্যবস্থা করবে রাজ্য প্রশাসন এটাই ছিল সকলের স্বাভাবিক ধারণা।কিন্তু না,একজন সিভিক ভলান্টিয়ার কে মূল আসামী হিসাবে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা হলো। দাবি করা হলো ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আসামী ধরে ফেলার সাফল্যের। একজন সিভিক ভলান্টিয়ার যে ওই হাসপাতালে কর্মরত নয়,অত রাতে হাসপাতালের সেমিনার কক্ষে পৌঁছে এরকম নৃশংস কান্ড ঘটিয়ে ফেললো অনায়াসে, কার গাফিলতিতে সে ওখানে পৌঁছতে পারলো সেটা এখনো চিহ্নিত হয়নি, ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল আধিকারিক বা কর্মীদের উপর।ব্যবস্থা নেওয়া তো দূরে থাক,এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড কে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করলেন হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার।সর্বোপরি হাসপাতালের অধ্যক্ষ সমস্ত ঘটনা কে আড়াল করার সব রকম চেষ্টা চালিয়ে গেলেন।এই অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে নানান অভিযোগ উঠে আসলেও কোনোরকম ব্যবস্থা তার বিরুদ্ধে নিতে পারে নি স্বাস্থ্য দপ্তর,কারণ তার মাথার উপর নাকি প্রভাবশালীদের হাত আছে।এই ঘটনায় যখন আর.জি.কর হাসপাতালের ভিতরে ও বাইরে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে চরম ক্ষোভ প্রকাশিত হচ্ছে,সেই সময় ক্ষোভ প্রশমনের চেষ্টায় অধ্যক্ষ পদে পদত্যাগ করলেন তিনি, স্বাস্থ্যদপ্তর তাকে তড়িঘড়ি ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে বদলি করে দিলেন।যে দপ্তরের দায়িত্বে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী।

সমস্ত ঘটনায় হতচকিত রাজ্যের মানুষ।সাধারণ মানুষের শোক - যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ ঘটলো জনবিক্ষোভে। রাস্তায় নামলো অগণিত মানুষ। বিচার চাই - "WE WANT JUSTICE" বাংলার সর্বস্তরের মানুষের মুখে একটাই স্লোগান। এ রাজ্যে থেকে সারা দেশ, দেশ ছাড়িয়ে অন্য দেশ সর্বত্র মানুষ ন্যায় বিচার চেয়ে রাস্তায় নেমেছেন। আমাদের রাজ্যে এই ক্ষোভের আগুন যখন দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়লো,প্রথম থেকেই তাতে নেতৃত্ব দিতে শুরু করলেন মহিলারা।ক্ষ্ম রাত দখলেক্ষ্মর কর্মসূচী,৭৮ তম স্বাধীনতা দিবসের পূর্ব রাতে পশ্চিম বাংলার সর্বত্র একেবারে শহর থেকে গ্রাম হাজার হাজার মহিলা রাস্তায়, বেশীরভাগের পরনে কালো পোশাক, হাতে মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট। একটাই ধ্বনি "We Want Justice "। এই দাবি নিয়ে মিছিল যত এগিয়েছে, মানুষের সংখ্যা তত বৃদ্ধি পেয়েছে। মিছিলে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের শরীরি ভাষায়, ন্যায় বিচার আদায়ের অদম্য জেদের বহিঃপ্রকাশ। মহিলাদের এই আহ্বানে সংহতি জানিয়ে পা মিলিয়েছে পুরুষেরাও। জাত - ধর্মের বালাই নেই, রাজনীতির রং নেই, মিছিলে পা মেলানো সকলেই চায় ন্যায় বিচার। রাজ্যের শাসক দলকে সমর্থন করেন এমন মানুষও নেমেছেন রাস্তায়, ক্ষোভ উগরেছেন সরকারের বিরুদ্ধে। রাজনীতির রং-হীন এই আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেও বিফল হয়েছে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল। ক্রমশঃ শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে এই আন্দোলনের।প্রথম পর্যায়ের পর দ্বিতীয় পর্যায়ে মহিলাদের রাত দখলের কর্মসূচী সম্পন্ন হয়েছে।একে একে পথে নামছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি, নামছে সাংস্কৃতিক সংগঠন, ক্রীড়া সংগঠন,সামাজিক সংগঠনগুলি।প্রায় প্রতিদিন ন্যায় বিচার চেয়ে পথে নামছেন স্কুল কলেজের প্রাক্তনী থেকে শুরু করে তথ্য প্রযুক্তির কর্মী সহ সর্বস্তরের মানুষ।শহর ছাড়িয়ে এই আন্দোলনের আঁচ পড়েছে মফস্বল এলাকায়, গ্রামাঞ্চলে। পাড়ায় পাড়ায় মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে পথে নামছেন। নামছে রাজনৈতিক দলগুলো। কিন্তু রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী থেকে অরাজনৈতিক মঞ্চের এই প্রতিবাদী কর্মসূচী যেন আগামীদিনের কোনো বার্তা বহন করছে। রাজ্য পুলিশ, সি.বি. আই, আইন - আদালত সব কিছুর শেষে ন্যায্য বিচারের আশায় এবার বাংলা জুড়ে পালিত হয়েছে রাখি বন্ধনের দিন ‘‘সম্ভ্রম রক্ষার বন্ধন ’’।

এ লড়াই চলতে থাকবেই ন্যায্য বিচার না পাওয়া পর্যন্ত, কেননা এ লড়াইয়ের নেতৃত্বে আমার মা - আমার বোন।

স্বাধীনতাহীনতার গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকবে মেয়েরা?

ঐশিকা সিনহা

কিরে আজ এত ফিরতে দেরী হলো? এত রাত করে কেউ বাড়ি ফেরে নাকি? ভদ্র ঘরের মেয়েরা এত রাত অবধি বাড়ির বাইরে থাকেনা, জানিস না তুই? জানিস তো কেমন দিনকাল, বেশি দেরি করিসনা, আলো থাকতে থাকতে বাড়ি চলে আসবি। একি! সাতটা বাজতে গেলো, এখন বাড়ি ঢুকছিস তুই? এই জন্য কোথাও তোকে ছাড়তে ইচ্ছে হয়না। বেশি নিজেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মনে করছিস না তুই ? বাব্বা দেখেছো! এই মেয়েটা একা ফ্ল্যাটে থাকে, আবার এত দেরী করে বাড়ি ফেরে। নিশ্চই ওর বাবা মা জানেন না, যে তাদের মেয়ে এত দেরী করে বাড়ি ফেরে। কিসের এত কাজ আমি বুঝিনা। আমিও তো পড়েছি, তারপর ঠিক সময় আমার বিয়ে হয়ে যায় আর এখন আমি নিশ্চিন্তে ঘর সংসার করছি। তাই আমি ঠিক আছি। আজকাল কার মেয়েরা যে কি এত কাজের নামে বাইরে থাকে ভগবানই জানে। এমা দেখেছি! কলেজে পড়ছে আর এখন থেকেই বাড়ি দেরী করে ফিরছে প্রায় ৮ টার দিকে। দেখেছো কাণ্ড! সবে ক্লাস টেন এ পড়ছে, আর এখনই মেয়েকে এত দূরে পাঠিয়ে দিলো স্কুল ট্রিপএ, প্রায় দু দিনের জন্য। কো-এড স্কুল, বুঝতেই পারছ? যদি উচ নিচ কিছু হয়ে মেয়ের তখন আর কেঁদে কুল পাবেনা। কিগো নিজের মেয়েকে একটু চোখে চোখে রাখো। বড়ো হচ্ছে, দিনকাল তো ভালো নয়। জানোই তো সব। আমার মনে হলো তাই বললাম, এবার তোমার মেয়ে তুমি দেখে নাও। প্রায় দেখছি তোমার মেয়ে দেরী করে বাড়ি ফিরছে। মেয়েকে একটু আটকাও এবার। এত কিসের বাইরে ঘুর ঘুর। বাড়িতে পা টেকে না নাকি? বেশি বললে তো আবার আজকাল কার মেয়ে, ঝগড়া শুরু করে দেবে। ভালো বলছি মেয়েকে দেখে রাখো, নাহলে জানোই তো সব। তোমার মেয়ে এত শর্ট ড্রেসেস পরে কেনো গো? এসব ঠিক না আমাদের সমাজের জন্য। মেয়েরা যদি শর্টস পরে, শর্ট ড্রেসেস পরে, স্লীভলেস জামাকাপড় পরে, তাহলে তো ন্যাচারালি ছেলেদের মন বিচলিত হবেই। ভুল তো মেয়েটার। মেয়েরাই তো এসব জামাকাপড় পরে ছেলেদের ইন্ধন যোগায় ইভ- টিজিং করতে। আর যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায় তাহলে তো স্বাভাবিক সেটা মেয়েটারই ভুল। একা রাতে বেরোবে, আবার এসব ছোটো জামা পরবে, হবেনা এরকম?

এই ওপরের কথা গুলো আমরা মেয়েরা সবাই কম বেশি নানান মানুষের থেকে শুনেছি আর কি টোনে বলা হয়েছে সেটা আমাদের চেনা তাইনা?

"সব ই তো জানো" এই সব জানার মধ্যে অজানা বিষয় টা হলো কেনো মেয়েদের ই এত সাবধানে থাকতে হবে বলতে পারেন? সত্যি কি আজ যদি একটা মেয়ে নিজের পছন্দ মতন শর্টস পরে, শর্ট ড্রেসেস পরে, স্লীভলেস জামাকাপড় পরে, "Is she really asking for it ?" ফিমেল বডি অবজেক্টিফিকেশন আর সেটা সোসাইটি যে ভাবে জাস্টিফাই করে সেটা কি কোনো দিন ও থামবেনা? কেনো সব সময় মেয়েদেরই একটা গন্ডির মধ্যেই জীবন যাপন করতে হবে? গন্ডির বাইরে যাওয়া মানেই কি বাড়ির মেয়ে হাত ছাড়া হয়ে যায়? আমাদের স্বপ্নের উড়ান কি কোনোদিনও দিতে পারবনা আমরা মেয়েরা? আর সেই উড়ান দিলেও কি সেই রেশ টা সমাজ ধরে থাকবে? আর যখন ইচ্ছে টান মেরে মাটিতে ফেলে পিষে দিয়ে আমাদের মনে করিয়ে দেবে যে এই অধিকার আমাদের শুধুমাত্র সমাজ দিয়েছে আর তাই ওনাদের নির্দিষ্ট অনুযায় আমরা চলতে বাধ্য?

সত্যি বলুনতো এই ভয়ে ভয়ে বেঁচে থাকাটা কষ্টদায়ক নয় মেয়েদের জন্য? জানেন ১৪ই আগস্ট যাদবপুর গেছিলাম আন্দোলনে সামিল হতে। সবার সমাগম আর রাস্তায় হুংকারের আওয়াজ এখনো কানে বাজছে। বৃষ্টিতে ভিজে, ঘেমে স্নান হয়ে যাওয়ার পরও এক একটা চিৎকারের সাতে গলা মিলিয়ে চোখে জল চলে আসছিল। কিন্তু সব কিছুর মধ্যে বেশির ভাগ মেয়েদের মধ্যে কি কথাটা ভাসছিল জানেন ? ক্ষুএই প্রথমবার আমরা সারা রাত কলকাতার রাস্তায় থাকলাম ভাই। অদ্ভুত একটা ফিলিং, বলে বোঝাতে পারবোনা। It somehow feels like an achievement আমরা সত্যি এত রাতে কলকাতার রাস্তায় loitering করছি। ঘড়ির কাঁটা যেমন থেমে থাকেনা, তেমনি এই প্রতিটা ঘন্টায় যেমন যেমন রাত বেড়ে সকাল হয়েছে এই কথাটা প্রায় বেশির ভাগ মেয়েদের মধ্যে ভাসছিল। প্রায় প্রত্যেকটা মেয়ের স্লোগান, চিৎকার, হুংকারে যেমন গম গম করছিল যাদবপুরের রাস্তা তেমনি একটা অদ্ভুত inner childish smile টাও মুখে লেগেছিল আর বার বার বলাবলি হচ্ছিল 'পুজো ছাড়া সত্যি আজ আমরা প্রথমবার এত দেরী অবধি কলকাতার রাস্তায় ঘুরছি?'

আমি এত কথার মধ্যে এটাই বোঝাতে চাইছি, আমরা নিরাপত্তা চাই, বাঁচতে চাই, আর পাঁচটা ছেলে যেমন বিনা দ্বিধায় বিনা ভয়ে রাস্তায় হাটা চলা করতে পারে তেমন ভাবেই আমরা মেয়েরাই আমাদের রাতের শহর টা কে দেখতে চাই হাসি মুখে। রাত ৮টা বাজলেই বাড়ি ফেরার পথে একটু অন্ধকার জায়গা দেখলেই যে ভয়ে টা করে, সেই ভয়টা প্রায় প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা মেয়েই ফেস করেছে। অন্ধকার রাস্তায় হেঁটে যাওয়ার সময় বার বার পেছন ফিরে দেখা, এই চিন্তায় আমরা ডুবে থাকি কেউ আসছে না তো পেছনে। ব্যাগ হাথরাতে হাতরাতে পেপার স্প্রে বা পকেট নাইফ রেডি রাখা আমাদের এক চেনা অভ্যাস হয়ে দিয়েছে। আর এরকমই একটা সিচুয়েশনে আর কি চিন্তা আমাদের মাথায় ঘরে জানেন? 'আজ যদি আমাদের সাথে এখানে কোনো অঘটন ঘটে যায়, আমি যদি চিৎকার করি, লোকজন আসবে তো আমাকে বাঁচাতে? নাকি আমার কেসটাও নানান মতের শিকার হবে আর শেষমেষ ভুলটা হবে আমার ?'

অন্য চোখে কাশ্মীর

অনিন্দিতা দে

এক

আমার কাশ্মীর যাওয়া একটা চাকরির সুত্র ধরে; সেটা ২০১৭ এর সেপ্টেম্বর মাস, শীত সবে শুরু হবে। স্কুলের চাকরী। তল্পিতল্পা বলতে সামান্য কয়েকটা জামাকাপড়, কিছু বই আর বিছানা। আমি গিয়ে পোঁছালাম কণিপপুরা, কুলগাম। দক্ষিণ কাশ্মীরের একটা গ্রামে। অবশ্য, শুনতেই গ্রাম। শহরের সব রকম সুবিধাই কম বেশি আছে সেখানে। তাছাড়া, কাশ্মীর মানেই যে আতঙ্ক আর অসুরক্ষিত একটা প্রদেশ, এই ধারণাটা আমার কেটে গিয়েছিল অনেক আগেই। কেমন করে কেটেছিল, সেটা বলবো পরে কখনো। এখানেও ভয়ের তেমন কিছুই দেখলাম না , সেই সুন্দর সবুজ গ্রামটাতে পৌঁছে। ভূস্বর্গ যদি কোথাও থাকে তা সে সত্যিই এখানে। সে এখানেই। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সূর্য্য অস্ত যাওয়া দেখছিলাম আর ভাবছিলাম কেন এত বিতর্ক এই কাশ্মীরকে ঘিরে? জীবন এখানেও সাবলীল, অথচ 'কাশ্মীর' শব্দটা শুনলেই যেন মনে হয় একটা আতঙ্কের কালকুঠি। গভীরে নেমে আর বিশ্লেষনের নিরীখে সেটাই আগে বুঝতে হবে। সেই প্রথম আমার কাশ্মীরকে অন্য চোখে দেখার ইচ্ছের উন্মেষ।

কাশ্মীর আর কাশ্মীরিয়াত। প্রদেশ আর তার ঐতিহ্য। এই দুইয়ের দ্বান্দ্বিকতা ঠিক যেন একটা পাঁচিলের মতো দাঁড়িয়ে আছে আধুনিক নগরায়ন আর ঐতিহাসিক জীবনাচরণের মাঝামাঝি। এটা যেন একটা সংস্কৃতির দোলাচলবৃত্তি, জীবনশৈলীর এক অদ্ভুত দ্বিচারিতা। যেন একটা প্রাগৈতিহাসিক ফসিল দাড়িয়ে আছে জীবন্ত অবস্থায়। কদিনেই বুঝতে পারছিলাম যে এই গ্রামের সরল জীবন যাত্রা যে কোনো ভারতীয় গ্রামেরই মতো, অথচ কোথায় যেন একটু অন্যরকম। সবাই আমারই মতন হয়তো, বা বলবো খুব সাধারণ মধ্যবিত্ত, কিন্তু তবুও যেন কেমন আলাদা। অবাক লাগতে থাকে। আতিথেয়তায় কাশ্মীরিরা সত্যি অতুলনীয়। প্রতিটা বিষয় যেন তারই প্রমাণ দেয়। কিন্তু যেটা সবচেয়ে অবাক করে; ওদের কাছে আমি একজন ভারতীয়, ভিনদেশী। যখন প্রশ্ন করি ওদের, যে তোমরা ভারতীয় নও? তখন ওরা ওদের সরলতাটুকু যথাযত বজায় রেখেই বলে, 'না আমরা তো কাশ্মীরি'।

আমার বোধ, আর বোধহয় আমার অবচেতন মনের বিভাব, একটা যুক্তি খাড়া করে। মনে হয়, হয়তো জানি উত্তরটা। কিন্তু আমার পঠনপাঠন, শিক্ষা, বাধ্য করে খুঁজতে এই 'তফাৎ যাওয়ার' তথ্য। এদিকে, আমার স্কুলের কাজও চলছিল পাশাপাশি। বুঝতে পারছিলাম এখানকার শিক্ষা বাবস্থা খুব নড়বড়ে, আর একটু বিরক্তও হচ্ছিলাম ভেবে যে, এরা স্বাভাবিক বিদ্যায়তনের ব্যাবহারিকতায় এত অবাক হয় কেন? যেন কিছুই বুঝতে পারছে না, অথচ খুব সচেতন ভাবে চেষ্টা করছে বুঝতে যে আমি কি ওদের সমাজ বহির্ভুত কিছু সন্তর্পনে মিশিয়ে দিচ্ছি ওদের মধ্যে। এর সাথে সাথেই মনের কোণে দানা বাঁধছিল আরো নানান প্রশ্ন। আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতি বলে যে, প্রথমত আমি ভারতীয়, তারপর আমি বাঙালি এবং তেমনি গুজরাটি রাজস্থানী বিহারী অসমিয়া; সবাই আগে ভারতীয় তারপর তাঁরা তাঁদের প্রাদেশিক অস্তিত্বের হকদার। তাহলে, একজন সাধারণ ছাপোষা কাশ্মীরি নিজেকে ভারতীয় ভাবতে চায় না কেন? কি সেই সংবেদনশীলতা, সেই দৌর্বল্য, সেই ভীতি যা কিনা ওদের নিজেকে ভারতীয় বলতে আটকে রাখে? আর এই বিষয়টাতে কি সেই জন্যই ওরা একটু স্পর্শকাতর, একটু বেশি সতর্ক? এবং মতের দিক থেকে এক জোট? সবসময় কিসের ভয়ে হিম হয়ে থাকে ওরা, নিজের প্রদেশে থেকেও? কাশ্মীর থেকে

বেড়িয়ে, ভারতের মূল ভূখন্ডের দিকে যেতে গেলে পেরোতে হয় জ্বাহর সুরঙ্গ (জহর টানেল)। সেই সুরঙ্গ পেরোতেই কেন ওদের বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়? সবই কি ১৯৯০ এর দান? ।

আমার পরিচয় বাড়ছিল। সেই সঙ্গে আমার কৌতূহলও। আমিও খুব সহজই মনে করছিলাম সবকিছু। ওদের লোকাচার, সমাজ, নীতিমালা এবং বিশ্বাস; কখনই অসম বলে মনে হয়নি আমার কোনোদিনই। এরই মধ্যে একদিন হুর-উন-নিশা, আমার এক সুন্দরী শিক্ষিত সহকর্মী, হঠাৎ আমায় এসে বলল, 'তুমি আজ আর বেরোবে না এই আফরতফরীর মাঝে, আমাদের স্কুলেই থেকে যাও'। আর স্কুল কতৃপক্ষও জানাল যে ছুটির পর ছাত্রছাত্রিদের স্কুলেই রাখার নির্দেশে জারি করা হয়েছে। জানতে পারলাম, মেন রাস্তার ধারে সুরাত বলে একটা গ্রামের মসজিদের কাছে ডাইনামাইট ফেটে মারা গেছে ছ'জন, আহত নাকি আরো অনেকেই। কিছু বোঝার আগেই সামরিক বাহিনী এসে ঘিরে ফেলল আমাদের স্কুল। যাকে বলে কর্ডন করে ফেলা। প্রায় চার ঘন্টা পর, সব কিছু স্বাভাবিক হবার পরে জানা গেল যে জাম্মু কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট বা 'জেকেএলএফ' নামে একটা সংগঠন এই বিষফোরণের

দায় নিয়েছে। 'জেকেএলএফ' আর মুজাহিদ (আই); এই দুটো সংগঠন নাকি দক্ষিণ কাশ্মীরে খুব সক্রিয়। হুরকে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? এরাই কি আতঙ্কবাদি? বলল, 'না তো। এরা কাশ্মীরি। ওরাই বলে যে ওরা নাকি মিলিট্যান্ট'। বুঝতে পারলাম যে, প্রথমত 'ওরা' হল সামরিক বাহিনী আর দ্বিতীয়ত 'ওরা' হল জেকেএলএফ'। খুব সহজভাবেই কথাটা বলল হুর। আমিই নিতে পারলাম না তত সহজে।

স্কুল বন্ধ রইল প্রায় তিন-চার দিন। তারপর আবার শুরু হল স্কুল। এই ব্যপারটা এখানে খুব স্বাভাবিক এবং লোকের যেটা গা-সওয়া হয়ে গেছে এইসব দেখে দেখে, সেটা হল স্ট্রাইক আর বনধ। ভাবা যায়, দিনের পর দিন স্কুল যায় না এখানে বাচ্ছারা, তাদের কোন দৈনিক রুটিন নেই। স্বাভাবিক জীবনধারা তারা বুঝবে কি করে? প্রায় প্রতিদিন রাতেই ঘুম ভাঙ্গে গুলির আওয়াজ বা সামরিক বুটের ধমকে। ঠিক যেন বিশ্বযুদ্ধ চলছে। কান পাতলেই শোনা যায়, কর্ডন কর্ডন। টিচারদের নিত্য দেরি করে স্কুলে আসা; কর্ডন। বাচ্ছারা তাদের হোমওয়ার্ক করতে পারেনি; কর্ডন। আজ কেউ লাঞ্চ আনেনি; কর্ডন। সবেতেই কারণ একটাই; কর্ডন। যেকোনো সময়েই যেকোনো পাড়ার যেকোনো মানুষের বাড়ি তাদের অনুমতি ছাড়াই ঘিরে ফেলতে পারে সামরিক বাহিনী। কর্ডন্ড হয়ে যেতে পারেন তাঁরা। সামরিক বাহিনী তাদের বাড়িতে ঢুকে নির্বিচারে চালাতে পারে তল্লাশি। কোনো প্রমাণ ছাড়াই গ্রেফতার হতে পারে যে কেউ। সবটাই রাষ্ট্রের সুরক্ষার অজুহাতে। যেন ধরেই নেওয়া হয়েছে কাশ্মীরি মানেই আতঙ্কবাদী। কাশ্মীরি মানেই তারা রাজদ্রোহে দোষী। এই নিত্য সঙ্গী আতঙ্কে কারো ছাড় নেই, রেহাই নেই কারো। না পণ্ডিত না ইমাম।

এই বিষয়টা ঠিক না ভুল, সেটা নির্ভর করে আমরা কোথায় আছি তার ওপর। শহরে বসে যতদিন কাগজ পড়েছি, ততদিন আমারও তাই-ই মনে হোত, কাশ্মীর মানেই সন্ত্রাসবাদ। আজ এখানে বসে মনে হচ্ছে, এই নিরীহ গ্রামীণ মানুষগুলো, আর যাই হোক, সন্ত্রাসবাদী নয়। আসলে, শুধু কি কাশ্মীর? সন্ত্রাস কোথায় নেই? কিন্তু, সব জায়গাই কি কাশ্মীর? আর সাধারণ লোকেরই বা কি দায় তাতে? তাঁরা তো চায় সহজ ভাবে বাঁচতেই। হুররা কিন্তু মুখ বুজেই মেনে নিয়েছে এই আদেশনামা। হয়তো আজ আর না মেনে উপায়ে নেই কিংবা যা আছে, তা এক উহ্য অতীত, আর তারই নেপথ্যে থেকে যাওয়া দায়ভার একটা। কেই বা তার খবর রাখে?

কাশ্মীরি রুটির স্বাদ ভুবন ভোলান। লাবাস, গির্দা, বারওঠ সবই ময়দার তৈরি বেকারির হাতরুটি। সকালের কাশ্মীরে প্রায় ঘরে ঘরেই নাস্তার সাথে নুন চা সহযোগে খাওয়া হয় এই রুটি। সেই রুটি কিনতেই বেড়িয়েছিল দাদু আর নাতি। তাঁরা কেউই জানত না যে এলাকাটা কর্ডন্ড করা আছে। খবর ছিলো, এক মিলিট্যান্ট তার অসুস্থ মাকে দেখতে আসছে লুকিয়ে। সকাল থেকেই ধুন্দুমার লেগেছিল। গোলাগুলি, এনকাউন্টার। ধরাও পরে সেই মিলিট্যান্ট। কিন্তু সেই ক্রসফায়ারে মারা যান দাদু। জখম হয় নাতি। তখনও তার হাতে ছিলো সেই রুটি। এই ঘটনাটা মিডিয়া এবং রাষ্ট্রসংঘ পর্যন্ত খুব ছড়িয়েছিল। আর তার কত রকমই না বাখ্যা করা হয়েছিল। কিন্তু ঘটনাটা তো ঘটে আমার চোখের সামনেই।

নিয়ম অনুসারে কর্ডন্ড বা ক্রসফায়ারের সময় সামরিক বাহিনীই সুরক্ষা দেয় আমজনতাকে। নিদেন পক্ষে একটা হুশিয়ার বার্তা দেওয়া হয় স্থানীয়দের। কিন্তু কিছুই করা হয়নি সেদিন, কারণ করা হলে হয়তো সেই মিলিট্যান্টকে ধরা যেতো না। আর, করা হলে হয়তো নাতি তার দাদুকে হারাত না। আজও বাস্তবটা বুঝতে পারি না। কোনটা ঠিক? কোনটা

কাম্য ? কোনটা ন্যায় ? আমার কাশ্মীর বাসকালে, আমি এরকম আরো অনেক ঘটনা দেখেছি যা নথিভুক্ত করা হয়নি, কিন্তু ঘটেছে। আমি দেখেছি নৃশংস মিলিট্যান্টদের হত্যাকান্ড, আর প্রায় প্রতিদিনই দেখেছি কাশ্মীরি মেয়েদের হারাতে তাঁদের সন্তান স্বামী বা ভাই। সারা ভারত যখন রক্তাল্পতায় ভুগছে, তখন এতো রক্তপাত কেন ? এই একটাই তো প্রশ্ন।

৩৭০ নয়, সন্ত্রাসবাদ নয়, জিহাদ নয়, হিন্দু-মুসলমান নয়, আসলে আমার যেন মনে হয়েছে কাশ্মীরিয়াত একটা সম্ভ্রম, একটা ঐতিহ্য, একটা সংস্কার। এই সংস্কার বা সংস্কৃতিটা বর্তমান প্রেক্ষিতে অ-হিন্দু বা পাকিস্তানি-সদৃশ বলেই কি এতো সংঘাত ? জানি না আমি। আসলে, সংস্কার বা সংস্কৃতি আনেকটাই প্রকৃতির মতন। ভৌগলিক মানচিত্রে আবদ্ধ থাকে না। যেমন পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশের ইলিশ, যেমন তামিল আর পূর্ব শ্রীলংকার ভাষা, যেমন রাশিয়া আর ইইক্রেনে ভোদকা অথবা ইস্রায়েল আর প্যালেস্টাইনের 'দোবকা' নাচের একই ভঙ্গিমা, একই দোলা। বুঝতে চাই এতে দোষ কোথায়, কিন্তু পারি না। জানতে চাই এতে দোষ কার, কিন্তু জানি না। পৃথিবীর এমন কোনো নাগরিক নেই যিনি সন্ত্রাসবাদের পক্ষে, যদি তিনি নিজে সন্ত্রাসবাদী না হ'ন। এমন কোন প্রদেশও নেই যা সন্ত্রাসবাদকে নিয়ে বাঁচতে চায়। তাই আমার চেনা কাশ্মীর আর দেখা কাশ্মীর বড্ড আলাদা হয়ে যায়। সব কিছুই সাবলীল অথচ তবুও কত ফারাক। কাশ্মীরে কোন সিনেমা হল নেই, নেই কোন কনসার্ট বা এন্টারটেনমেন্ট ক্লাব নেই, কখনো দেখেছি সুফি গানের মেহফিল অথবা খতুনের লোকসঙ্গীত, চারচীনারে নিচে হাউসবোটে, কচিকাঁচা ছেলেমেয়েদের হোক্স-ফুকস (অনেকটা আমাদের ইকড়ি-মিকড়ি খেলার মত), এই সবই একটা আলাদা মাত্রা যোগ করে কাশ্মীরিয়তে, সেটা আতঙ্ক নয় আনন্দ। কেহবা, নুনচা, বাজবান, ফেরণ, আর কাঙরি মনে করিয়ে দেয় সুন্দরী কাশ্মীরের আড়ালেও আরেকটা আলাদা কাশ্মীর আছে। সেটা বুঝতে গেলে কাশ্মীরে থাকতে হয়, কাশ্মীরিয়াতে অবগাহন করে। সেটাও যে ভারতবর্ষেরই ভারতীয়তা।

(চলবে)

কাশ্মীর কী বলছে, শোনো

নন্দন রায়

কাশ্মীরে এক নীরব আলোড়ন চলছে। কবে থেকে ? জানিনা। আসলে বাকি ভারতের ভূখন্ড কাশ্মীরের কথা শুনতে পায় না। যদিও দেশের শাসকবর্গ ছাতি বাজিয়ে অহরহ ব'লে চলেছে 'কাশ্মীর আমাদের', কিন্তু তারাও কাশ্মীরের কথা শুনতে পায় না, শোনার ইচ্ছেও নেই। কিন্তু সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনের পর থেকেই মনে হচ্ছে নির্বাচনী ফলাফলের মধ্য দিয়ে, এতাবৎকাল পর্যন্ত যে কাশ্মীরে ক্ষীণকায় পোলিং পারসেন্টের মধ্য দিয়ে ভারতের বাকি অঙ্গরাজ্যের নির্বাচনী উন্মাদনার বিপরীতে যে কাশ্মীরে ভোটের ফলাফলে যে ক্লান্তি ঝরে পড়ত, সেই কাশ্মীর এবার যেন কিছুটা ব্যতিক্রমী। মনে হয় কাশ্মীর কিছু বলছে।

দেখে শুনে মনে হচ্ছে,রশিদ খান নামের এক ভূতের প্রচ্ছায়া গোটা কাশ্মীর উপত্যকাকে আবৃত ক'রে ফেলেছে।কিন্তু এই প্রচ্ছায়া কোন হিংস্র রক্তপাতময় মৃত্যু মিছিলের পুনরাবির্ভাবের কারণে নয় যে, মানুষকে আবার কার্ফু ও কাটাতারের বেড়ায় ঘরবন্দী ক'রে মিলিটারী বুটের ত্রস্ত পদচারণা এবং অটোমেটিক রাইফেলের মুহূর্মুহু অগ্নিবর্ষণের মধ্যে আতঙ্কিত প্রহর কাটাতে হবে। এ এক উজ্জ্বল বিশ্বাসের জায়মান প্রহর যখন আব্দুল রশিদ শেখ, যিনি অধিক পরিচিত ইঞ্জিনিয়ার রশিদ নামে, যিনি উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লা লোকসভা কেন্দ্র থেকে একজন নির্দল প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ ক'রে সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। এটা কোনও চিন্তার ব্যাপার নয় যে তিনি জেলে বসেই নির্বাচিত হয়েছেন। এটাও কোন চিন্তার ব্যাপার নয় যে এখন তিনি ইউএপিএ আইনে তিহার জেলে বন্দী এবং বাঘে ছুলে যেমন আঠেরো ঘা, তেমনই,ইউএপিএ-তে একবার গ্রেফতার হ'লে জামিন পাওয়া ব্যতিক্রম। যেমন উমর খালিদের জেলবাস চার বছর হয়ে গেল। ইঞ্জিনিয়ার রশিদ সম্ভবত পাঁচ-ছ' বছরের বেশিই বন্দী । রশিদের নির্বাচিত হওয়ার ঘটনা খুবই আশ্চর্য ঘটনা, কারন আগে নির্দল প্রার্থী কিছু জয়ী হতেন, এখন তা অতি বিরল। এবারের নির্বাচনে মাত্র আর একজনই নির্দল হিসেবে হয়েছেন;ভীম আর্মির প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রশেখর আজাদ। তবে রশিদের সাথে আর কারো তুলনাই চলেনা। এক তো জেলে বন্দী থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, তিনি আক্ষরিক অর্থেই কপর্দকহীন। কীভাবে যে মনোনয়নের টাকা তিনি জোগাড় করেছেন তা জানেন তিনি আর ঈশ্বর। প্রচার যা হয়ে

তা লোকের মুখে মুখে, তা-ও শুধু এই খবরটুকু যে 'আমাদের' ইঞ্জিনিয়ার রশিদ বারামুল্লা থেকে ক্যান্ডিডেট হয়েছেন। শুধুএইটুকু খবর বোবা কাশ্মীরের অন্তরে অন্তরে এক ভিন্নতর আদর্শের মশাল জ্বালিয়ে দিল। বারামুল্লা সযতনে গোপনে নিজেদের হৃদয়ে তাকে স্থাপিত করলো। কোন জলুস বেরলো না, কোন স্লোগান উচ্চারিত হ'ল না, শুধু মনের গোপনে জ্বলে উঠলো এক অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি, যে অভ্যুত্থানে কার্বাইন গর্জে ওঠেনা,যে অভ্যুত্থান সঙ্ঘঠিত হয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে ব্যবহার ক'রে, নির্বাচনী ব্যবস্থার ফল্ট লাইনকে আশ্রয় ক'রে। যে আবেগ ও বিশ্বাসকে এই অভ্যুত্থান আশ্রয় ক'রে সঙ্ঘঠিত হয়েছে সেই আদর্শকে কয়েদ করা যায় না।

বারামুল্লা লোকসভা আসনটি যে রশিদ জিতে নিয়েছেন, এটা মোটেই বড় কিছু ঘটনা নয়, বড় ঘটনা হ'ল যে ভাবে ও যাদেরকে হারিয়ে তিনি জয়লাভ করেছেন। সংসদে যাওয়ার পথে তিনি হারিয়েছেন ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী যিনি আগামী সম্ভাব্য নির্বাচনের পরে পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আশা পোষণ করেন সেই ওমর আবদুল্লাকে এবং রশিদের প্রাক্তন রাজনৈতিক গুরু ও পিপলস কনফারেন্সের নেতা সাজ্জাদ গণি লোনকে;প্রথম জনকে দু'লক্ষভোটে এবং দ্বিতীয় জনকে তিন লক্ষ ভোটে। মেহবুবা মুফতির পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী তো ধর্তব্যের মধ্যেই নেই। রশিদের এই বিজয়ের নির্গলিতার্থ বুঝতে আঞ্চলিক দলগুলি নিশ্চয়ই ভুল করেনি। যদিও তাদের নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যে স্বীকার করবেন না, তবু যৎকিঞ্চিৎ যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়েছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে যে আঞ্চলিক দলগুলির নেতৃত্বের শিরদাঁড়া বেয়ে এক শীতল স্রোত বয়ে যাচ্ছে এই কথা ভেবে যে আসন্ন সম্ভাব্য বিধানসভা ভোটে রশিদের বিজয়ের কী প্রতিক্রিয়া হ'তে পারে।

ইঞ্জিনিয়ার রশিদ কেবলমাত্র এক রুদ্ধ আবেগের অর্গলমুখ খুলে দেওয়ার প্রতিনিধিত্ব করে না, কাশ্মীরের জনসমষ্টির বৃহদংশের মনোভাবেরও প্রতিনিধিত্ব করে;বলাবাহুল্য, সেই মনোভাব গভীরভাবে এবং মৌলিকভাবে ভারত রাষ্ট্র বিরোধী।বিজেপির শত ঢক্কানিনাদ সত্ত্বেও এ কথা কাশ্মীরের কোলের শিশুটিও জানে যে ২০১৯-এর ৫ আগষ্টের আগের থেকে এখন পরিস্থিতি আরও খারাপ এবং তা এতটাই যে গোটা কাশ্মীর উপত্যকার একটি আসনেও বিজেপি প্রার্থী দিতে ভয় পেয়েছে। এবারের লোকসভা নির্বাচনে কাশ্মীরে বিপুল হারে ভোট পড়ায় মোদি-শাহ বুক বাজিয়ে ব'লে বেড়াচ্ছিল যে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের কারণেই কাশ্মীরে শান্তি ফিরে এসেছে, সেটা যে কত বড় মিথ্যা সেকথা মোদি-শাহের চেয়ে বেশি ভাল আর কেউ জানেনা। শুধু বারামুল্লা নয়, গোটা কাশ্মীরে বিপুল হারে ভোটপড়ার কারণ হ'ল মর্যাদা হারানো, আত্মসম্মান হারানো, অত্যাচারিত কাশ্মীরের সেই ফুটন্ত ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ যা অনুক্ত কণ্ঠে ইঞ্জিনিয়ার রশিদের স্লোগানের স্লোগানের অনুরণন তোলে, 'জেল কা বদলা ভোট সে লেঙ্গে'।

খুব সংক্ষেপে বললে, স্বাধীন ভারতের ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখা যায় যে যদিও ভারতের সাথে জম্মু ও কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তিকরণ চুক্তির পর থেকে সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এই রাজ্যের বিশেষ মর্যাদার বিষয়টিকে ভারত সরকার মেনে চলছিল, তবে সময়ের সাথে সাথে, বিশেষ ক'রে গত শতকের সত্তর-এর দশকের পর থেকে(যখন থেকে হিন্দুত্ববাদীরা শক্তিশালী হয়ে উঠছিল এবং জাতীয় কংগ্রেসের দেশ জোড়া প্রভাব হ্রাস পেতে শুরু করেছিল)এই 'বিশেষ মর্যাদার' অন্তর্গত বিষয়গুলি নিয়ে দিল্লীর সরকার অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করতে শুরু করে। এর সঙ্গে প্রতিক্রিয়া হিসেবে যোগ হয় পাল্টা অসহিষ্ণুতার প্রকাশ, সীমান্ত পারের উস্কানী। সবমিলিয়ে ৩৭০ অনুচ্ছেদ আরও লঘু করা হ'ল, সন্ত্রাসবাদের জন্ম হ'ল, অবশেষে নব্বই-এর দশকে ফেটে পড়লো ব্যাপক সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাস দমনের জন্য পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর বেলাগাম পীড়ন এবং অত্যাচার। (ইঞ্জিনিয়ার রশিদ সেই সময়কার দিনলিপি বিভিন্ন উর্দু পত্রিকায় প্রতিবেদন আকারে লিখে রেখেছেন।) হিন্দুত্ববাদীরা প্রথম দিন থেকেই ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপের পক্ষে সওয়াল ক'রে এসেছে। তারা যেমন একদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এসেছে, অন্যদিকে ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের বিচিত্রতা এবং সুক্ষ্মতা বোঝার জন্য পন্ডিত নেহরুর মত জ্ঞান ও দুরদৃষ্টি তাদের ছিল না এবং তা আয়ত্ত করার চেষ্টাও তারা করেনি। এটা তাদের রাজনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর দীনতা। ফলে দিল্লীর ক্ষমতায় এসে তারা যে ৩৭০ অনুচ্ছেদের বিলোপ এবং কাশ্মীরিদের আরও অপমান করতে রাজ্যটিকে দুটি ইউনিয়ন টেরিটরিতে বিভক্ত ক'রে দেবে এতে আশ্চর্য হওয়ার খুব বেশি কিছু নেই। কেবলমাত্র কংগ্রেস, ডিএমকে ও বামপন্থীরা, যারা ভারতের বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বের সন্ধান করে, এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিল। এছাড়া এনডিএর শরিক হওয়া সত্ত্বেও জেডিইউ বিরোধিতা করেছিল কিন্তু জোট ত্যাগ করেনি, আপ, তেলেগু দেশম ও মায়াবতীর বিএসপি প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছিল, তৃণমূল ও শারদ পওয়ারের এনসিপি কক্ষত্যাগ করেছিল। ভারতের সংবিধানে ২০১৯ সালের ৫ আগষ্ট দিনটি কালিমালিপ্ত থেকে যাবে।

সম্ভবত, গত শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই রশিদ কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনগুলি থেকে নিজের দুরত্ব

বাড়িয়ে নিয়েছিলেন, আবার আঞ্চলিক মূল ধারার রাজনৈতিক দলগুলির মতের সঙ্গেও তার মত মিলছিল না। তাই তিনি নির্দলই থেকে গেলেন, কিন্তু কখনই রাজনীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে নয়। নির্দল হিসেবেই তিনি নিজের জন্মস্থান বারামুল্লার ল্যাংগেট বিধানসভা ক্ষেত্র থেকে জয়লাভ ক'রে বিধানসভার সদস্য ছিলেন ২০০৮ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত যতদিন না মোদির সরকার বিধানসভা ভেঙে দিয়ে কাশ্মীরে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করে এবং রশিদকে কারারুদ্ধ করে।রশিদ একটি কথা স্থির জানেন যা-ই ঘটে যাক, মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক হারানো চলবে না। এই বিশ্বাসই এবারে বারামুল্লা কেন্দ্র থেকে তাকে জয় এনে দিয়েছে। এবারে কাশ্মীর জুড়ে যে বিপুল পরিমাণে ভোট পড়েছে এবং ইঞ্জিনিয়ার রশিদের মত নির্দল প্রার্থীর বিপুল জয় এনে দিয়েছে, তাতে নতুন একটি রাজনৈতিক সম্ভাবনা কাশ্মীরের মাটিতে সম্ভবত জায়মান হয়ে উঠছে।

কবে থেকে কাশ্মীর জনমনে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের কথা বলার এই তাগিদ জাগরূক হয়ে উঠেছে, সে কথা কাশ্মীরের মানুষই জানেন। যখন থেকে ছররার পেলেটে শত কিশোর কিশোরী চিরতরে পঙ্গু অথবা অন্ধ হয়ে গিয়েছে, অথবা যখন থেকে ব্লেডযুক্ত কাঁটাতারের বেড়ায় মহল্লার পর মহল্লা দিনের পর দিন অবরুদ্ধ থেকেছে , অথবা যখন থেকে মধ্যরাতে বাড়ি বাড়ি হানা দিয়ে স্ত্রী-পুরুষ-বালক-বালিকা নির্বিশেষে সকলকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বরফ জমা রাস্তার দুপাশ দিয়ে লাইন ক'রে মাইলের পর মাইল খালি পায়ে হেঁটে যেতে বাধ্য করা হয়েছে যাতে রাস্তার মাঝখান দিয়ে যাওয়া সেনা কনভয়ের গাড়িগুলি জঙ্গিদের চোরাগোপ্তা আক্রমণের বিরুদ্ধে এই মানব-ঢালের আড়ালে থাকতে পারে, সম্ভবত সেই সব কালরাত্রির সময়ে প্রতিরোধের এই নতুন উপলব্ধি কাশ্মীরিদের চেতনায় কল্লোল তুলেছে।

দেশের অন্য অঞ্চলের মানুষরা রাহুল গান্ধীর বিস্ময়কর 'ভারত জোড়ো' যাত্রার শেষ লগ্নে তুষারপাতের মধ্যে অচঞ্চল বিপুল সমাবেশে শতসহস্র কাশ্মীরির নীরব যোগদানের মধ্যে এর অনুরণন খুঁজে পেয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠিত আঞ্চলিক ও জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলি বারে বারে কাশ্মীরের বিশ্বাসের অমর্যাদা করেছে। কিন্তু মোদির সরকার গত দশ বছর ধরে যে ভাবে কাশ্মীরের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ চালিয়েছে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য বহিরাগতদের কাশ্মীরে বসতি স্থাপন করার উৎসাহ দিয়ে , তার তুলনা একমাত্র ইজরায়েলের প্যালেস্তাইন - ভূমিতে অনুরূপ আচরণ।

সুপ্রীম কোর্টের তাড়নায় সেপ্টেম্বরে হয়তো নির্বাচন হবে, কিন্তু তা হবে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের গুরুত্বহীন নির্বাচন। রাজ্যের মর্যাদা ফেরত পাওয়া এখনো বিশ-বাঁও জলে। উলটে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ অঞ্চলের লেফটেনান্ট জেনারেলের ক্ষমতা যেভাবে বাড়ানো হয়েছে তার ফলে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর হাতে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়রের চেয়েও কম ক্ষমতা থাকবে।

মূল ভুখন্ডের ভারতীয়দের দুটি কর্তব্য রয়েছে;এক, বিশেষ মর্যাদা পুনরুদ্ধারে কাশ্মীরের মানুষের পাশে সহযোদ্ধার ভূমিকা পালন করা, এবং দুই, কাশ্মীরের আপামর মানুষকে সৌভ্রাতৃত্বের আলিঙ্গনে আবদ্ধ করা।

সহায়তাঃ দি টেলিগ্রাফ পত্রিকার ২৫ জুলাই সংখ্যায় সংকর্ষণ ঠাকুরের উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধ এই লেখার অনুপ্রেরণা। এই লেখার রাজনৈতিক ও অন্যান্য বক্তব্য বর্তমান লেখকের নিজস্ব।

নাগরিক স্মৃতিচারণা ঃ
অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

আহমাদ ইশতিয়াক

১

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের জন্ম ১৯১১ সালের ৫ মে চট্টগ্রামের পটিয়ার ধলঘাট গ্রামে। তাঁর বাবা জগদ্বন্ধু ওয়াদ্দেদার ছিলেন চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল অফিসের হেড কেরানী আর মা প্রতিভাদেবী ছিলেন গৃহিণী। পরিবারে ছয় ভাই বোনের মধ্যে প্রীতিলতা ছিলেন দ্বিতীয়। প্রথমে তার বড় মধুসূদন, তারপর প্রীতিলতা, এরপর কনকলতা, শান্তিলতা, আশালতা ও সন্তোষ। বহু পূর্বে নামের শেষে তাদের পদবী ছিল দাশগুপ্ত। পরিবারের কোনো এক পূর্বপুরুষ নবাবী আমলে তওয়াহেদেদারদ উপাধি পেয়েছিলেন বলে নামের শেষে যুক্ত হয়েছিল এই ওয়াহেদেদার থেকে ওয়াদ্দেদার বা ওয়াদ্দার। শৈশবে প্রীতিলতার বাবা জগদ্বন্ধু ওয়াদ্দেদার তাঁর বাবার মৃত্যুর পর নিজের পৈতৃক বাড়ি ডেঙ্গাপাড়া সপরিবারে ত্যাগ করেন পটিয়া থানার ধলঘাট গ্রামে মামার বাড়িতে বড় হয়েছিলেন। এই বাড়িতেই প্রীতিলতার জন্ম হয়েছিল। মা প্রতিভাদেবী প্রীতিলতাকে আদর করে ডাকতেন ত্রাণীদ। এক সময় ধলঘাট ছেড়ে চট্টগ্রামে চলে আসে প্রীতিলতার পরিবার। চট্টগ্রাম শহরের আসকার দীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়ে টিনের ছাউনি দেয়া মাটির একটা দোতলা বাড়িতে স্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করে ওয়াদ্দেদার পরিবার। এখানেই বেড়ে ওঠা প্রীতিলতার।

ছোটবেলা থেকেই কিছুটা অন্তর্মুখী, অনেকটা মুখচোরা ও লাজুক প্রীতিলতা। মায়ের সঙ্গে গৃহস্থলীর কাজে দারুণ পটু ছিল। ঘরের নানা কাজে মাকে সাহায্য করতো ছোট্ট রাণী।

প্রীতিলতার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন শুরু হয় সাত বছর বয়সে ১৯১৮ সালে ডা. খাস্তগীর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার মধ্য দিয়ে। প্রতি ক্লাসের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রীতিলতার ফলাফল ছিল দারুণ। ভালো ফলাফলের জন্য সব শিক্ষকই ভীষণ স্নেহ করত প্রীতিলতাকে। সেই শিক্ষকদের মধ্যে একজন ছিলেন ইতিহাসের ঊষা দি। তিনি প্রীতিলতাকে পুরুষের বেশে ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাই এর ইংরেজ সৈন্যদের সাথে লড়াইয়ের ইতিহাস বলতেন। স্কুলে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন ছিলেন কল্পনা দত্ত। এক বছরের বড় প্রীতিলতা কল্পনার সাথে ব্যাডমিন্টন খেলতো। তাদের স্বপ্নের কথা পরবর্তী কালে লিখেছিলেন কল্পনা দত্ত। লিখেছিলেন তকোন কোন সময় আমরা স্বপ্ন দেখতাম বড় বিজ্ঞানী হব। সেই সময়ে ঝাঁসীর রানী আমাদের চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে। নিজেদেরকে আমরা অকুতোভয় বিপ্লবী হিসাবে দেখা শুরু করলাম।

প্রীতিলতা তখন সবে শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে পা রেখেছেন। চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা তখন মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন শেষে সক্রিয় হচ্ছিলেন। এর মধ্যে ১৯২৩-এর ১৩ ডিসেম্বর টাইগার পাস এর মোড়ে সূর্য সেনের বিপ্লবী সংগঠনের সদস্যরা প্রকাশ্য দিবালোকে সরকারি কর্মচারীদের বেতন বাবদ নিয়ে যাওয়া ১৭ হাজার টাকা ছিনতাই করে। এ ছিনতাইয়ের প্রায় দুই সপ্তাহ পর গোপন বৈঠক চলাকালীন অবস্থায় বিপ্লবীদের আস্তানায় হানা দিলে পুলিশের সাথে যুদ্ধের পর গ্রেপ্তার হন সূর্য সেন এবং অম্বিকা চক্রবর্তী। তাদের বিরুদ্ধে করা হয় রেলওয়ে ডাকাতি মামলা। এই ঘটনা কিশোরী প্রীতিলতার মনে অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়।

স্কুলের প্রিয় শিক্ষক ঊষা দির সাথে আলোচনার মাধ্যমে এই মামলার ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে অনেক কিছুই জানতে পারেন তিনি। ঊষা দির দেওয়া ঝাঁসীর রাণীদ বইটি পড়ার সময় ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের জীবনী তার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

১৯২৪ সালে বেঙ্গল অর্ডিনান্স নামে এক জরুরি আইনে বিপ্লবীদের বিনা বিচারে আটক করা শুরু হয়। চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের অনেক নেতা ও সদস্য এই আইনে আটক হয়েছিলেন। তখন বিপ্লবী সংগঠনের ছাত্র আর যুবকদের অস্ত্রশস্ত্র, সাইকেল ও বইপত্র গোপনে রাখার ব্যবস্থা করতে হতো। সরকার বিপ্লবীদের প্রকাশনা বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে। প্রীতিলতার নিকট-আত্মীয় পূর্ণেন্দু দস্তিদার তখন বিপ্লবী দলের কর্মী। তিনি বাজেয়াপ্ত কিছু গোপন বই প্রীতিলতার কাছে রাখেন। তখন তিনি দশম শ্রেণির ছাত্রী। লুকিয়ে লুকিয়ে তিনি পড়েন তদেশের কথাদ, তবাঘা যতীনদ, তক্ষুদিরামদ আর তকানাইলালদ। এই সব বই প্রীতিলতাকে বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে।

প্রীতিলতা দাদা পূর্ণেন্দু দস্তিদারের কাছে বিপ্লবী সংগঠনে যোগ দেওয়ার গভীর ইচ্ছার কথা বলেন। কিন্তু তখনো পর্যন্ত বিপ্লবী দলে নারী সদস্য গ্রহণ করা হয়নি। এমনকি নিকট আত্মীয় ছাড়া অন্য কোনো মেয়েদের সাথে মেলামেশা করাও বিপ্লবীদের জন্য নিষেধ ছিল।

স্কুলে আর্টস এবং সাহিত্য প্রীতিলতার প্রিয় বিষয় ছিল। ১৯২৬ সালে সংস্কৃত পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন প্রীতিলতা। ১৯২৮ সালে তিনি কয়েকটি বিষয়ে লেটার মার্কস পেয়ে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। শুধু গণিতের নাম্বার খারাপ ছিল বলে তিনি বৃত্তি পেলেন না।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর ছুটির সময় নাটক লেখেন প্রীতিলতা এবং মেয়েরা সবাই মিলে সে নাটক চৌকি দিয়ে তৈরি এক মঞ্চে পরিবেশন করেছিলেন। পরীক্ষার ফলাফল দেওয়ার সময়টাতে তার বাড়িতে এক বিয়ের প্রস্তাব আসে। কিন্তু প্রীতিলতার প্রবল আপত্তির কারণে বিয়ের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিলেন তার মা।

আই.এ. পড়ার জন্য ঢাকার ইডেন কলেজে ভর্তি হন প্রীতিলতা। এ কলেজে র ছাত্রী নিবাসের মাসিক থাকা খাওয়ার খরচ ছিল ১০ টাকা এবং এর মধ্যে কলেজের বেতনও হয়ে যেত। এ কারণেই অল্প বেতনের চাকুরে জগদ্বন্ধু ওয়াদ্দেদার মেয়েকে আই.এ. পড়তে ঢাকায় পাঠিয়েছিলেন।

ঢাকায় যখন প্রীতিলতা পড়তে যান তখন তশ্রীসংঘদ নামে একটি বিপ্লবী সংঘঠন ছিল। এই দলটি প্রকাশ্যে লাঠি খেলা, কুস্তি, ডন বৈঠক, মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা ইত্যাদির জন্য ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ক্লাব তৈরি করেছিল। ঢাকায় শ্রীসংঘের তদীপালী সঙ্ঘদ নামে একটি মহিলা শাখা ছিল। লীলা নাগের নেতৃত্বে এই সংগঠনটি নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য কাজ করতো। গোপনে তারা মেয়েদের বিপ্লবী সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করার কাজও করত।

ইডেন কলেজের শিক্ষক নীলিমাদির মাধ্যমে লীলা রায়ের সাথে প্রীতিলতার পরিচয় হয়েছিলো। তাদের অনুপ্রেরণায় দীপালী সঙ্ঘে যোগ দিয়ে প্রীতিলতা লাঠি খেলা, ছোরা খেলা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি লিখেছিলেন তআই এ পড়ার জন্য ঢাকায় দু'বছর থাকার সময় আমি নিজেকে মহান মাস্টার দার একজন উপযুক্ত কমরেড হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়েছি।

১৯২৯ সালের মে মাসে চট্টগ্রামে সূর্য সেন ও তাঁর সহযোগীরা চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের জেলা সম্মেলন, ছাত্র সম্মেলন, যুব সম্মেলন ইত্যাদি আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ

করেন। নারী সম্মেলন করবার কোনো পরিকল্পনা তখনও ছিল না কিন্তু পূর্ণেন্দু দস্তিদারের বিপুল উৎসাহের জন্যই সূর্য সেন নারী সম্মেলন আয়োজনের সম্মতি দিলেন।

মহিলা কংগ্রেস নেত্রী লতিকা বোসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে প্রীতিলতা ঢাকা থেকে এবং তার বন্ধু ও সহযোদ্ধা কল্পনা দত্ত কোলকাতা থেকে এসে যোগদান করেন। তাদের দুজনের আপ্রাণ চেষ্টা ছিল সূর্য সেনের অধীনে চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলে যুক্ত হওয়ার কিন্তু ব্যর্থ হয়ে তাদের ফিরে যেতে হয়।

১৯৩০ সালের ১৯ এপ্রিল আই এ পরীক্ষা দিয়ে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম ফিরে আসেন প্রীতিলতা। আগের দিন রাতেই চট্টগ্রামে বিপ্লবীদের দীর্ঘ পরিকল্পিত আক্রমণে ধ্বংস হয় অস্ত্রাগার, পুলিশ লাইন, টেলিফোন অফিস এবং রেললাইন। এটি চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহদ নামে পরিচয় লাভ করে। চট্টগ্রামের মাটিতে বিপ্লবী দলের এই উত্থান সমগ্র বাংলার ছাত্রসমাজকে উদ্দীপ্ত করে। প্রীতিলতা লিখেছিলেন তপরীক্ষার পর ঐ বছরেরই ১৯শে এপ্রিল সকালে বাড়ি ফিরে আমি আগের রাতে চট্টগ্রামের বীর যোদ্ধাদের মহান কার্যকলাপের সংবাদ পাই। ঐ সব বীরদের জন্য আমার হৃদয় গভীর শ্রদ্ধায় আপ্লুত হল। কিন্তু ঐ বীরত্বপুর্ণ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে না পেরে এবং নাম শোনার পর থেকেই যে মাষ্টারদাকে গভীর শ্রদ্ধা করেছি তাঁকে একটু দেখতে না পেয়ে আমি বেদনাহত হলামদ।

১৯৩০ সালে আই এ পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম এবং সবার মধ্যে পঞ্চম স্থান লাভ করেছিলেন প্রীতিলতা। এই ফলাফলের জন্য তিনি মাসিক ২০ টাকার বৃত্তি পান সঙ্গে কলকাতার বেথুন কলেজে বি এ পড়ার সুযোগ। তিনি যখন বেথুন কলেজে পড়তে যান তখন তার দাদা পূর্ণেন্দু দস্তিদার যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। যুব বিদ্রোহের পর তিনি মধ্য কলকাতায় বিপ্লবী মনোরঞ্জন রায়ের পিসির বাসায় আশ্রয় নেন। প্রীতিলতা ওই বাসায় গিয়ে দাদার সঙ্গে প্রায় দেখা করতেন। বেথুন কলেজে মেয়েদের সাথে অল্প কয়েকদিনেই আন্তরিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল প্রীতিলতার। দারুণ বাঁশি বাজাতেন প্রীতিলতা। বানারসী ঘোষ স্ট্রীটের হোস্টেলের ছাদে বসে প্রীতিলতার বাঁশি বাজানো উপভোগ করতো কলেজের মেয়েরা। প্রীতিলতার বি.এ. তে অন্যতম বিষয় ছিল দর্শন। দর্শনের পরীক্ষায় তিনি ক্লাসে সেরা হয়েছিলেন। দর্শন বিষয়ে অনার্স করার ইচ্ছে ছিল প্রীতিলতার, কিন্তু পরবর্তীতে বিপ্লবের সাথে যুক্ত হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষার কারণে অনার্স পরীক্ষা তার আর দেওয়া হয়নি।

পূর্ণেন্দু দস্তিদার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেলে মনোরঞ্জন রায় (যিনি পরবর্তীতে ক্যাবলা'দা নামে পরিচিত) নারী বিপ্লবীদের সংগঠিত করার কাজ করেন। যুব বিদ্রোহের পর পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার এবং কারাগারে বন্দী নেতাদের সাথে আত্মগোপনে থাকা সূর্য সেনের সাথে বিভিন্নভাবে যোগাযোগ হতো। তারা তখন আরো হামলার পরিকল্পনা করছিল।

(শেষাংশ পরের সংখ্যায়)

বাংলাদেশের রাজনীতি ঃ অস্থিরতা ও অভ্যুত্থান অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ

মজিবুর রহমান

বিশ্বের সর্বাধিক বাঙালির বসবাসের দেশ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। প্রকৃতপক্ষে, বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি বাঙালি বাংলাদেশে বসবাস করে। আজকের বাংলাদেশ তথা পূর্বতন পূর্ববঙ্গ এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গ অর্থাৎ অখণ্ড বঙ্গপ্রদেশ ছিল ব্রিটিশ ভারতের বৃহত্তম রাজ্য। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণেও বঙ্গপ্রদেশ সর্বাধিক সক্রিয় ছিল। ব্রিটিশ শাসনের ১৯০ বছরের ইতিহাসে রাজনৈতিক বন্দিত্ব ও শহীদের মৃত্যু বরণের দিক থেকেও বাঙালি একনম্বরে ছিল।১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের পথচলা মসৃণ হলেও পাকিস্তানের অংশ হিসেবে পথ চলতে পূর্ববঙ্গ স্বচ্ছন্দ্য বোধ করেনি।

ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগ করা যে ঠিক হয়নি তা পাকিস্তান সৃষ্টির কয়েক মাসের মধ্যেই প্রমাণ হতে শুরু করে। ১৯৪৭ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ওই দুই ভূখণ্ডের মোট জনসংখ্যার যথাক্রমে ৮০ ও ৯০ শতাংশ। কিন্তু ধর্মের এত মিল থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানের এই দুই অংশের মধ্যে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে এমন সংঘাত সৃষ্টি হয় যে মাত্র সিকি শতকের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশে পরিণত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের বিরাট অংশ পাকিস্তান দাবিকে সমর্থন করে। ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ শাসিত অবিভক্ত বাংলার শেষ নির্বাচনে মুসলিম লীগ জয়লাভ করে। তখন মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকত। তার অধিকাংশ আসনেই মুসলিম লীগ জয়লাভ করে।ফজলুল হক সাহেবের কৃষক প্রজা পার্টি পরাস্ত হয়। মুসলিম লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন হোসেন শহীদ সুরাবর্দি। এর পরই দেশ স্বাধীন হয় এবং পূর্ব বাংলা পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত হয়।

পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের রাজনীতিতে কখনও শান্তি, সুস্থিতি, স্থিরতা বিরাজ করতে দেখা যায়নি। দু-একটা পরিসংখ্যান থেকেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। এই যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভাবে জয়যুক্ত হয়। মুখ্যমন্ত্রি হন এ কে ফজলুল হক। তিনি তাঁর মন্ত্রীসভার তরুণ সদস্য মুজিবর রহমানকে নিয়ে কলকাতায় আসেন।কিন্তু ফেরার অব্যবহিত পর ১৯৫৫ সালে তাঁর মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করা হয় । ১৫.৮.১৯৪৭ থেকে ৭.১০.১৯৫৮ পর্যন্ত মাত্র ১১ বছরে পূর্ব পাকিস্তানে ৫ জন ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ১০ বার সরকার গঠন করেছেন। গভর্নর হয়েছেন ১০ জন ব্যক্তি। গভর্নরের শাসন জারি হয়েছে অন্তত ২ বার।আর, ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবরের পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক আইনসভারই কার্যত বিলোপ ঘটে।এই সময় থেকে '৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ শাসন করেন আরও ১২ জন গভর্নর।

স্বাধীন বাংলাদেশেও যখন তখন সরকার ভাঙা-গড়ার খেলায় ছেদ পড়েনি। ১৯৭২ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশে একটার পর একটা শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান করতে হয়েছে- রাষ্ট্রপতির জন্য ১৮ বার, প্রধানমন্ত্রীর জন্য ১১ বার এবং প্রধান উপদেষ্টার জন্য ৫ বার। বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি কারাবাস ভোগ করেছেন। বিভিন্ন দলের অনেক নেতাকর্মী সামরিক বা গণঅভ্যুত্থানে প্রাণ হারিয়েছেন, আদালতের বিচারে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলেছেন অথবা কারাগারের মধ্যে নিহত হয়েছেন।

কয়েক দশক ধরে চলা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রাণ হারিয়েছেন এমন মানুষের সংখ্যা এক লাখের বেশি নয়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের মাত্র নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রায় ত্রিশ লক্ষ মানুষের প্রাণ যায়। কয়েক লক্ষ মা ও বোন ধর্ষিতা হয়েছেন।পাকিস্তানি সেনাদের হাতে এমন বিরাট সংখ্যক প্রাণহানির একটা বড় কারণ ছিল সংশ্লিষ্ট এলাকার অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। 'ঘরের শত্রু বিভীষণ' হিসেবে রাজাকার, আলবদর ও আল শামস বাহিনী পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে মুক্তিযোদ্ধা ও পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষকে হত্যা ও নির্যাতন করেছিল। অন্য কোনো দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে এমন সাংঘাতিক অন্তর্ঘাতের দৃষ্টান্ত খুব একটা আছে বলে মনে হয় না। স্বাধীনতা অর্জনের পরও বাংলাদেশে এই অন্তর্ঘাত বন্ধ হয়নি। দেশের স্বার্থে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে দেখা যায়নি। এর ফলে সেখানে শান্তি, সুস্থিতি ও উন্নয়ন অনেকদিন পর্যন্ত অধরাই থেকেছে। পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হলে ভারতের বিরাট লাভ হবে এবং পূর্ববঙ্গ ভারতের উপনিবেশে পরিণত হবে, এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়েই পূর্ববঙ্গের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের মানুষ তাদের দেশের স্বাধীনতা ও পুনর্গঠনের বিরোধিতায় মত্ত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। কিন্তু ঘটনা হল, পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও রাজাকারদের সঙ্গে অসম লড়াইয়ে মুক্তিযোদ্ধারা ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছিল এবং পূর্ববঙ্গে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি বাড়ছিল। ভারতীয় ভূখণ্ডেও পাকবাহিনীর ছোঁড়া কিছু বোমা পড়ে। এছাড়াও ১ কোটি শরণার্থী ভারতে এসে আশ্রয় নেয়।

এমতাবস্থায় ভারতীয় সেনাবাহিনী পূর্ববঙ্গে প্রবেশ করে এবং মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশে কোনো ঘাঁটি না গেঁড়ে সকল ভারতীয় সেনা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। বিগত পাঁচ দশকেও জনসংখ্যা ও আয়তনের বিচারে বিশাল রাষ্ট্র ভারতকে তার প্রতিবেশী ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বাংলাদেশের ওপর কখনও প্রভুত্ব বা দাদাগিরি করতে দেখা যায়নি।

পূর্ববঙ্গের প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় '৭১-এর ২৫ মার্চ এবং স্বাধীনতা অর্জিত হয় ১৬ ডিসেম্বর। এই রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের প্রায় পুরো সময়টাই আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী ছিলেন। আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনা করার তাঁর কোনো সুযোগ ছিল না। তিনি '৭২-এর ১০ জানুয়ারি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১২ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের হাল ফেরাতে ব্যর্থ হন। দেশ পুনর্গঠনের কাজে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থন ও সহযোগিতা তিনি পাননি। শাসকদল আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের মধ্যেও 'এলোমেলো করে দে মা লুটেপুটে খাই' গোছের মনোভাব তৈরি হয়। '৭২-এর অক্টোবরে আওয়ামী লীগের একটা অংশ বেরিয়ে গিয়ে জাতীয়তাবাদী সমাজতান্ত্রিক দল বা জাসদ গঠন করে। '৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর নতুন সংবিধান কার্যকর করার পর '৭৩ সালের ৭ই মার্চ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুলভাবে বিজয় লাভ করলেও বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শেখ মুজিব সক্ষম হননি। লুঠপাট, ভাঙচুর ও খুনোখুনি চলতেই থাকে। '৭৪ সালে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা ও অরাজকতার মুখে '৭৪-এর ২৮শে ডিসেম্বর দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। '৭৫-এর

২৫শে জানুয়ারি এক সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দলের বিলুপ্তি ঘটানো হয়। '৭৫-এর ২৪শে ফেব্রুয়ারি গঠিত হয় দেশের একমাত্র রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বা বাকশাল।বাকশাল গঠনের মধ্য দিয়ে বহুদলীয় সংসদীয় সরকার পদ্ধতি পরিবর্তন করে একদলীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। বাকশাল-এর চেয়ারম্যান তথা সর্বাধিনায়ক হয়ে শেখ মুজিব রাষ্ট্র পরিচালনার সকল ক্ষমতা নিজের হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা করেন।চারটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংবাদপত্র বাংলাদেশ অবজারভার, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ টাইমস ছাড়া বাকি সবগুলোর প্রকাশনা নিষিদ্ধ করা হয়। বাকশাল পুরোপুরি কার্যকর হওয়ার কথা ছিল '৭৫-এর পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে। শেখ মুজিব বাকশাল গঠনকে দ্বিতীয় বিপ্লব বলে অভিহিত করেন কিন্তু তা যে বাংলাদেশে একনায়কতন্ত্র কায়েম করার লক্ষ্যেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মুজিব ভেবেছিলেন তিনি কৃষিতে কৃষক সমবায় গঠন করে ও কল কারখানা পরিচালনা শ্রমিকদের অংশীদার করে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতন একদলীয় সমাজতন্ত্র করবেন। চরম বিশৃঙ্খল ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির মধ্যে বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে এবং '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট ভোর রাতে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে খুন হন। একদল খুনী সামরিক অফিসার তাঁর বাড়ি আক্রমণ করে তাঁর স্ত্রী, ভাই আবু মাসের , তিন ছেলে কামাল , জামাল ও রাসেল , দুই পুত্রবধূকে হত্যা করে। কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে থাকায় বেঁচে যান। বঙ্গবন্ধুর ওই বাড়ির কাছেই হত্যা করা হয় ভাইপো শেখ ফজলুল হক মনি ও তাঁর গর্ভবতী স্ত্রীকে। আরেকটি বাড়িতে থাকতেন বঙ্গবন্ধুর তুতো ভাই আব্দুর রব সেরনিয়াবাত। তাঁর বাড়িতে তাঁর মেয়ে, এক ছেলে ও শিশু নাতি কে হত্যা করা হয়। এই সামরিক অফিসাররা পাকিস্তান আর্মি তে ছিল

এই নৃশংসতার ট্রেনিং তারা সেখান থেকেই পেয়েছিল। অনেক দেশে অভ্যুত্থান করে সামরিক জান্তার ক্ষমতা দখলের কথা আমরা জানি। কিন্তু এই রকম নৃশংস হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশ ছাড়া কোথাও হয়নি। ওই হত্যার আড়াই মাস পর ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ঢুকে মুক্তি সংগ্রামের চার জাতীয় নেতা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ , সৈয়দ নজরুল ইসলাম , এফ. কামরুজ্জামান ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে নৃশংস ভাবে হত্যা করে ওই সেনারা।

শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের পর বাকশালের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য খান্দকার মোশতাক আহমেদ (১৯১৯-১৯৯৬) ১৫.৮.৭৫ থেকে ৬.১১.৭৫ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বঘোষিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিন মাসেরও কম সময়ের মধ্যে তাঁকে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং আওয়ামী লীগের নেতা আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম (১৯১৬-১৯৯৭) রাষ্ট্রপতি মনোনীত হন। '৭৭-এর ২১শে এপ্রিল সায়েমকে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরিয়ে রাষ্ট্রপতির আসন দখল করেন সেনাবাহিনীর প্রধান জিয়াউর রহমান (১৯৩৬-১৯৮১)। জিয়াউর একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে।আইন করেন জে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের কোনও বিচার কখনো হবেনা। এই Indemnity Act জিয়াউর প্রণীত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ Act.

জিয়াউর '৭৮-এর পয়লা সেপ্টেম্বর গঠন করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি)।

১৯৭৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। '৮১ সালের ৩০শে মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সামরিক বাহিনীর কয়েকজন সদস্যের হাতে নিহত হন। এরপর রাষ্ট্রপতি হন বিএনপি'র নেতা আব্দুস সাত্তার (১৯০৬-১৯৮৫)। '৮২ সালের ২৪শে মার্চ এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সেনাপ্রধান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ (১৯৩০-২০১৯) প্রধান সামরিক প্রশাসক হিসেবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন এবং বিচারপতি আবুল ফজল মোহাম্মদ আহসান উদ্দিন চৌধুরীকে (১৯১৫-২০০১) রাষ্ট্রপতির পদে বসানো হয়। '৮৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর চৌধুরীকে সরিয়ে এরশাদ নিজেই রাষ্ট্রপতির আসনে অধিষ্ঠিত হন। '৮৬-এর পয়লা জানুয়ারি রাজনৈতিক দল জাতীয় পার্টি গঠন করে তিনি ৭ই মে দেশের তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করেন। তাঁর দল সরকার গঠন করে। কিন্তু দুই বছরের মধ্যেই '৮৮ সালের তেশরা মার্চ চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ করা হয়। এবারও জাতীয় পার্টি জেতে। বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সহ অধিকাংশ দল এই নির্বাচন বয়কট করে। শেষ পর্যন্ত গণ অভ্যুত্থানের জেরে স্বৈরশাসক হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ৬ই ডিসেম্বর ১৯৯০ রাষ্ট্রপতির পদ থেকে সরে যেতে বাধ্য হন। অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্রপতি হন বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ (১৯৩০-২০২২)।

২৭.২.১৯৯১ অনুষ্ঠিত পঞ্চম সাধারণ নির্বাচন থেকে বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা ফিরে আসে। প্রধানমন্ত্রী হন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্ত্রী তথা বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। ১৫.২.৯৬ অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ

সাধারণ নির্বাচন আওয়ামী সহ অধিকাংশ বিরোধী রাজনৈতিক দল বয়কট করে। এই নির্বাচনে বিএনপি জয়লাভ করলেও তারা তা উপভোগ করতে পারেনি এবং চার মাসের মধ্যেই ১২.৬.৯৬ সপ্তম সাধারণ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী হন শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা তথা আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা। উল্লেখ্য, শেখ হাসিনা তাঁর পিতা নিহত হবার পর থেকে ভারতে থাকতেন। তিনি ১৭ই মে ১৯৮১ বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করেন। ২০০১ সালের পয়লা অক্টোবর অনুষ্ঠিত অষ্টম সাধারণ নির্বাচনে বিএনপি জয়লাভ করে এবং বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হন।তবে তাঁর এই মন্ত্রিসভা ছিল জামাত ই ইসলামীর সঙ্গে জোট সরকার। লোকে বলত খালেদা - নিজামী জোট সরকার। এই সরকারের আমলে ক্রমাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় , আহমেদিয়া, শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর আক্রমণ চলতে থাকে। পীরদের দরগাগুলি আক্রান্ত হয় ।শেখ হাসিনার জীবনের ওপর গ্রেনেড আক্রমণ হয়।

২০০৬ সালে এই খালেদা নিজামী জোট সরকারের মেয়াদ শেষ হয়। অনেক টালবাহানার পর ২৯.১২.২০০৮ এ অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ এবং শেখ হাসিনা দ্বিতীয় বার প্রধানমন্ত্রী হন। এই সরকারের আমলে ১৯৯১ সাল থেকে চলে আসা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন আয়োজনের ব্যবস্থা রদ করা হয়। ৫.১.১৪ অনুষ্ঠিত দশম, ৩০.১২.১৮ অনুষ্ঠিত একাদশ ও ৭.১.২৪ অনুষ্ঠিত দ্বাদশ সাধারণ নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে এবং শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হন। দ্বাদশ নির্বাচন বিএনপি সহ বেশ কয়েকটি দল বয়কট করে। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে গণঅভ্যুত্থানের জেরে ৫ ই আগস্ট শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়তে বাধ্য হন এবং দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেন। ৮ই আগস্ট শান্তিতে নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হয়।

ঘন ঘন সামরিক বা গণ অভ্যুত্থান ঘটা কোনো দেশের জন্য ভালো ঘটনা হতে পারে না। ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের প্রচেষ্টা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। রাজনৈতিক প্রতিহিংসাও গণতন্ত্রের ভিতকে দুর্বল করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে এই সব নেতিবাচক ঘটনাই বারবার ঘটেছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দুর্নীতিও সেদেশের একটি বড় সমস্যা।সাম্প্রদায়িক শক্তিও সবসময় সক্রিয় থাকে। সাম্প্রতিক গণঅভ্যুত্থানে খুনোখুনি, লুটপাট ও ভাঙচুরের ঘটনার মধ্যে কিছু অস্বাভাবিকতা দেখা গেছে। গণসচেতনতা ছাড়া গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে কি কোনো রাষ্ট্র বা সমাজের সত্যিকারের সংস্কার সাধন সম্ভব?

বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থান কি গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতার পথ সুগম করবে

সৌর বসু

শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে সর্বাপেক্ষা বেশি সময় আসীন ছিলেন। প্রথম পর্বে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এবং পরবর্তী সময়ে ২০০৯ থেকে ২০২৪ সর্ব মোট কুড়ি বছর তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান কে একদল সেনা অফিসার সপরিবারে হত্যা করে।খোন্দকার মোস্তাক আহমেদকে প্রেসিডেন্ট করে সেনারা ক্ষমতা দখল করে। তিনমাস পর ওই সেনারা ঢাকা জেলে ঢুকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ সহ চার জাতীয় নেতাকে হত্যা করে।এরপর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখল করেন। ছয় বছর ক্ষমতায় থাকার পর ১৯৮১ সালে, তিনি আর একদল সেনা অফিসারের আক্রমণে নিহত হন। জিয়ার আমলেই, জামাত ই ইসলামীকে স্বাগত জানানো হয় এবং বাংলাদেশের মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ধর্মের প্রভাব ফিরে আসে। জামাত নেতা গোলাম আজম পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। এরশাদ ক্ষমতায় এসে ইসলামকে জাতীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেন। শেখ মুজিব এবং তার কন্যা শেখ হাসিনা ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ চেয়েছিলেন। জিয়াউর রহমান ও এরশাদের চিন্তাধারা ছিল এর বিপরীত। তাদের আমলে রাজনীতিতে ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটে। জেনারেল জিয়ার পত্নী খালেদা জিয়া জমায়েত ই ইসলামীর সহায়তায় প্রধানমন্ত্রীর আসন লাভ করেন। । বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রায় রাজনৈতিক ইসলামের একটা চোরাগোপ্তা প্রভাব বরাবরই ছিল। রাজনৈতিক ইসলামকে শেখ হাসিনা ভয় পেতেন।

২০২৪ সালের ৫ অগাস্ট শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেবার পর ভারতবর্ষে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। খবরে প্রকাশ শেখ হাসিনা ইংল্যান্ডে যেতে চেয়েছিলেন ,কিন্তু সদ্যগঠিত লেবার গভর্নমেন্ট , তার আর্জি প্রত্যাখ্যান করে। ফিনল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শেখ হাসিনাকে প্রবেশের

অনুমতি দেয়নি বলেই রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে। বেলারুস এবং রাশিয়ার নামও মাঝে শোনা গিয়েছিল , তার গন্তব্যের উদ্দেশ্য বলে। বর্তমানে তিনি ভারতবর্ষে অবস্থান করছেন। শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর বাংলাদেশে যে ঘটনা ঘটে, তা শ্রীলংকার রাষ্ট্রপতি মাহিন্দা রাজাপাকসের (Mahinda Rajapaksa) পতনের পরবর্তী ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেয়। শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর বাংলাদেশের জনগণ রাস্তায় নেমে উল্লাস করতে থাকে।। কিন্তু সেই উল্লাস বিশৃংখল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। উন্মত্ত জনতা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন গণভবন ও জাতীয় সংসদ লুঠ করে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মারকগুলি ধ্বংস করে, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত মিউজিয়াম গুলির উপর হামলা চালায়, সর্বোপরি বাংলাদেশের স্রষ্টা মুজিবুর রহমানের আবক্ষ মূর্তির ওপর হাতুড়ির আঘাত করে। তাঁর ৩২ নং ধানমন্ডির বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। ওখানে অবস্থিত মিউজিয়ামটি ধ্বংস করে।

উন্মত্ত জনতার লক্ষ্য ছিল সরকারি প্রতিষ্ঠান, আওয়ামী লীগ মন্ত্রীদের বিলাসবহুল বাড়ি, সরকারি গণমাধ্যম প্রভৃতি। অনেক আওয়ামী লীগ কর্মী ও পুলিশ নিহত হয়। লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগ চলে। অনেক জায়গায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ চলে।

হাসিনা সরকারের পতনের আগে থেকেই জামায়েত ই ইসলামী ও বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি এই আন্দোলনকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের চেষ্টা শুরু করে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তাদের প্রথম সভা বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি ও জামায়েত ইসলামীদের সঙ্গে আয়োজন করেছিল।

বাংলাদেশ ছাত্র সমন্বয়ক কমিটি সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিবাদ করে বলে ছাত্রদের কমিটির সঙ্গে আলোচনা না করে কোনও সরকার গঠিত হলে ছাত্ররা তা মেনে নেবে না। ছাত্র কমিটির মুখপাত্র নাহিদ ইসলাম বলেন রক্তের বিনিময়ে আমরা শেখ হাসিনার স্বৈরতান্ত্রিক সরকারকে হটিয়ে দিয়েছি। আমরা গণতান্ত্রিক একটি সরকার গঠন করতে চাই যার মূল লক্ষ্য হবে সামাজিক ন্যায় সুরক্ষিত জীবন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা। বাংলাদেশের নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ মোঃ ইউনুসকে উপদেষ্টা করে আমরা নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

বাংলাদেশের যে অভ্যুত্থান ঘটলো তাকে দুইভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে । প্রথমত কোটা সংস্কার আন্দোলন এবং দ্বিতীয়ত অর্থনৈতিক বৈষম্য, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব।

প্রকৃতপক্ষে শেখ হাসিনার আমলে ২০১৫ সাল থেকে যে তিনটি নির্বাচন হয়েছে, সেগুলি অস্বচ্ছ। অর্থাৎ নির্বাচনে কারচুপির মাধ্যমে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসেছেন। শেষ নির্বাচনটিতে বিরোধী পক্ষ অংশগ্রহণ করেনি। হাসিনার বিরুদ্ধে নির্বাচনে অস্বচ্ছতা একটা বড় অভিযোগ।

বাংলাদেশের কোটা ব্যবস্থা সিভিল সার্ভিসে প্রথম থেকেই আছে। ৫৬ শতাংশ কোটার ভিত্তিতে এবং ৪৪ শতাংশ মেধার ভিত্তিতে। এই ৫৬ শতাংশের মধ্যে ৩০ শতাংশ ছিল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং তার বংশধরদের জন্য সংরক্ষিত।। অবশিষ্ট ২৬ শতাংশ কোটা ছিল নারীদের জন্য, আদিবাসীদের জন্য, অনুন্নত অঞ্চলের জন্য, অন্যভাবে যারা সক্ষম নয় তাদের জন্য প্রভৃতি। এই কোটা পদ্ধতিতে মুক্তিযোদ্ধাদের তিন প্রজন্ম অবধি সুযোগ পেয়েছে। বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিক মুক্তিযোদ্ধাদের এই কোটার মাধ্যমে সিভিল সার্ভিস এ চাকরি পাওয়ার বিষয়টি ভালোভাবে গ্রহণ করেনি।। কারণ বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের অভাব রয়েছে। সে কারণে ২০১৮ সালে এই ৩০ কোটা পদ্ধতির বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন হয়। এই আন্দোলনের পর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিছুটা বিরক্ত হয়ে কোটা পদ্ধতি বন্ধ করে দেন। পরবর্তীকালে মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের কয়েকজন এর বিরুদ্ধে গিয়ে আদালতে মামলা করে।

মামলার রায় বেরোয় এ বছর জুন মাসে। এই রায়ে বাংলাদেশ হাইকোর্ট মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ত্রিশ শতাংশ কোটা পুনর্বহাল করার নির্দেশ দেয়। ছাত্র আন্দোলনের সুত্রপাত এখান থেকেই। ইউক্রেনের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাব বাংলাদেশ অর্থনীতিতে এসে পড়েছে। বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়, বাংলাদেশের যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি তাতে উপরতলার কতিপয় মানুষ উপকৃত হলেও, গরিব মানুষদের অবস্থা কোনও হেরফের হয়নি। ফলে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায়।

হাইকোর্টের রায় প্রকাশিত হবার পর ছাত্ররা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন শুরু করে।। ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন এই আন্দোলনে বাধার সৃষ্টি করে বলে খবরে প্রকাশ। যদিও তার জন্য কোনও হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে নি। কারণ প্রতিবাদী ছাত্ররা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের উপরে আস্থা রেখেছিল। সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য হাইকোর্টের নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ দেয় । বিষয়টির ওপর শুনানি চলছিল।

১৬ই জুলাই শেখ হাসিনা একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন। এই সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন মুক্তিযোদ্ধার নাতিপুতিদের চাকরি দেবো না তো কি রাজাকারদের নাতিপুতিদের চাকরি দেবো। রাজাকার শব্দটি সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশীদের কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য একটি শব্দ। শেখ হাসিনার এই কটুক্তি ছাত্র আন্দোলনে ঘৃতাহুতি পড়ে। দাবানলের মতো

রাস্তায় রাস্তায় ছাত্র বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এই ছাত্র বিক্ষোভ দমন করতে গিয়ে হাসিনা প্রশাসন ছাত্রদের ওপর গুলি চালায়। গুলির আঘাতে অনেক ছাত্র নিহত হয়।এই বিক্ষোভে ছাত্ররা ছাড়াও বিভিন্ন নাগরিক সংগঠন, গণতান্ত্রিক সংগঠন, শিক্ষক সংগঠন এবং সাধারণ মানুষ যোগদান করে। বাংলাদেশ গণঅভ্যুত্থান শুরু হয়।

প্রকৃতপক্ষে বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশে অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডার হ্রাস পেয়েছিল। বৈদেশিক ঋণের মাত্রা অত্যাধিক বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ও ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির Distinguished অধ্যাপক আলী রিয়াজের মতে শেখ হাসিনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছেন। অধ্যাপক আলী রিয়াজের বক্তব্য অনুসারে শেখ হাসিনা ব্যবসায়িদের একটি ছোট গোষ্ঠী এবং আমলাতন্ত্রের কিছু মানুষকে নিয়ে একটি জোট তৈরি করেছিলেন। এই জোটের মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল পুলিশ এবং সামরিক বাহিনী। সমগ্র পুলিশ বাহিনী রাষ্ট্র যন্ত্র না হয়ে ক্ষমতাসীন দলের স্বার্থকেই বড় করে দেখেছে। হাসিনা ছাত্রদের বিক্ষোভ দমন করার জন্য সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর করেছেন। হাসিনার মধ্যে একটা ভয়ের আবহও কাজ করতো। সেই কারণেই তিনি বাংলাদেশের জনসমজে একটি ভীতিকর পরিবেশ তৈরি করেছিলেন। বাংলাদেশের মানুষ সেখানে হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলতে ভয় পেত। বাংলাদেশে মানুষের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন হাসিনা। ছাত্র আন্দোলনের উপর যখন গুলি বর্ষণ হয়, ২০০ ছাত্র প্রাণ হারায়, তখন ছাত্রসহ বাংলাদেশের মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ে। ছাত্র বিক্ষোভ গণ অভ্যুত্থানের আকার ধারণ করে। শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশত্যাগী হন।

দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক অঙ্ক ক্রমশ জটিল হয়ে পড়ছে। বিগত কয়েক বছরের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার পাকিস্তান , শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশের সরকারের পতন ঘটেছে। নেপালেও মাওবাদী সরকারের পরিবর্তে কে.পি শর্মা অলি ক্ষমতায় এসেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় আধিপত্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে বিগত কয়েক দশক ধরে ঠান্ডা লড়াই চলছে। ভারতের সঙ্গে কৌশলগত কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো ছিল । রাশিয়া কর্তৃক ইউক্রেন কে আক্রমণের পর, ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখছে। ইউক্রেন আক্রমণের পর ভারত রাশিয়ার সমালোচনা করে নি।

উপরন্তু ভারত রাশিয়ার থেকে তেল আমদানি করছে। অন্যদিকে চিন বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিসিয়েটিভ এর মাধ্যমে পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশের মধ্যে পরিকাঠামো গঠনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে চীনের বেল্ট এন্ড রোড ইনিসিয়েটিভ কর্ম সূচিকে ভারতের প্রতিবেশী এই রাষ্ট্রগুলি সমর্থন যোগাচ্ছে।।

বর্তমানে বাংলাদেশের যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন হয়েছে সেটা একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এরা রাষ্ট্রের সংস্কার চায় এবং বাংলাদেশের কর্তৃত্ববাদী ঐতিহ্যের অবসান ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচন করে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চায়। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর কে হত্যা করার পর বাংলাদেশে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। শেখ মুজিবরের গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা , এবং সমাজতন্ত্রের আদর্শের পরিবর্তে সামরিক ইসলাম প্রাধান্য পেয়েছিল । দক্ষিণ এশিয়ায় একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের আধিপত্য স্থাপনের প্রক্রিয়া এবং অন্যদিকে বাংলাদেশের সামরিক ইসলামিক এবং স্বৈরাচারী শাসনের ধারাকে অতিক্রম করে গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা এবং কাঠামো সংস্কারের ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকার কতদূর সাফল্য লাভ করবে সে বিষয়ে সংশয় থেকে যায়।

বাংলাদেশ ঃ ৩২ নম্বরের বাড়ি ইতিহাসের অগ্নিদগ্ধ স্মারক

সাদিয়া মাহ্জাবীন ইমাম

পুড়িয়ে দেওয়া হল বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর।

পুড়ে গেলে চেনা ঘরও অচেনা হয়ে যায়। যেমন হয়েছে রাজধানীর ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের ঐতিহাসিক বাড়িটি ৫ আগস্টের পর। এখন শুধু বাড়িটির কাঠামোই আছে। তিনতলার ঘরে ময়লার স্তূপে পড়ে আছে ডালাখোলা ভাঙা একটি লাল স্যুটকেস। ধ্বংস হয়ে গেছে বাড়ির তিনটি তলায় জমানো সব ঐতিহাসিক ও পারিবারিক স্মৃতিচিহ্ন।

স্বাধিকার আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশের জন্ম ও ১৯৭৫ সালের ঘটনা পার হয়ে ২০২৪ সালে আবারও এক ইতিহাস জন্মাল ৬৩ বছর বয়সী বাড়িটি নিয়ে। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার নিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সূত্র ধরে ৫ আগস্ট বাংলাদেশে ঘটে যায় ছাত্র,জনতার অভ্যুত্থান। সেদিন ৩২ নম্বরের এ বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়।

ইতিহাসের বাড়ি ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ বাড়িতে পরিবার নিয়ে বসবাস শুরু করেছিলেন ১৯৬১ সালের অক্টোবরে। এরপর এই বাড়ির ওপর দিয়ে বয়ে গেছে

ইতিহাসের নানা প্রবাহ। ১৯৬২ সালের আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের রূপরেখা নানা আন্দোলনের পথ ধরে এসে ঠেকে ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলনে। এরপর একে একে আসে ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান আর ১৯৭০ সালের নির্বাচন। ৩২ নম্বরের এই বাড়ি থেকেই বঙ্গবন্ধু তাঁর নির্দেশনা দিতেন, জনসংযোগ চালাতেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর ৩২ নম্বর বাড়ি থেকেই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র দিয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৫০,এর দশকে মুজিব পরিবারের ঢাকা শহরে স্থায়ীভাবে বসবাসের জায়গা ছিল না। রাজনৈতিক কারণে অনেকেই পরিবারটিকে বাসা ভাড়া দিতে অনীহা দেখাতেন। ১৯৫৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান মন্ত্রী থাকাকালে তাঁর একান্ত সচিব নূরুজ্জামান বেগম মুজিবের অনুরোধে ধানমন্ডি এলাকার জমির জন্য গণপূর্ত বিভাগে আবেদনপত্র জমা দেন। ১৯৫৭ সালে ছয় হাজার টাকায় ধানমন্ডিতে এক বিঘা জমি বরাদ্দ পান তাঁরা। সেখানে প্রথমে দুই কক্ষবিশিষ্ট একতলা বাড়ি তোলা হয়। বাড়িটিতে তখন মাত্র দুটি শোবার ঘর ছিল। একটিতে থাকতেন সস্ত্রীক শেখ মুজিবুর রহমান, অন্যটিতে তাঁর মেয়েরা। একটি রান্নাঘর বানানো হয়েছিল। সেটির একপাশে থাকতেন তাঁর দুই ছেলে।

১৯৬৬ সালে দোতলায় পরিবারটির বসবাস শুরু হলে নিচতলার নিজেদের শোবার ঘরটি গ্রন্থাগার হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। বাড়িতে ঢুকতেই ছিল ছোট একটি কক্ষ। সেটি ব্যবহৃত হতো ড্রয়িং রুম হিসেবে। তৃতীয় তলা তৈরি হয়েছে বহু পরে।

পুড়ে যাওয়ার আগে পুরো বাড়িটিকেই রূপান্তর করা হয়েছিল জাদুঘরে। প্রতিটি কক্ষ ছিল ঐতিহাসিক নানা স্মৃতিচিহ্ন দিয়ে সাজানো।

ইতিহাসের দলিল ঃ পুড়ে যাওয়া বাড়িটির দায়িত্বে থাকা ছাত্ররা জানান, আগুন লাগার খবর শুনে তাঁরা এসেছেন যতটা সম্ভব স্মৃতিচিহ্নগুলো রক্ষা করতে। ঘটনার পরদিন কেউ কেউ এসে কিছু বই ফিরিয়ে দিয়ে গেছেন বলে জানান তাঁরা। তাঁরা জানান, নিজেদের তাগিদেই তাঁরা বাড়িটি পরিচ্ছন্ন করার দায়িত্ব নিয়েছেন।

জাদুঘরে থাকা বিভিন্ন প্রদর্শন সামগ্রীর মধ্যে ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যবহার করা পাইপ, চশমাসহ পরিবারের বিভিন্ন তৈজস। ছিল শেখ রাসেলের খেলনা। ছিল নিহত হওয়ার সময় মুজিব পরিবারের সদস্যদের গায়ে থাকা পোশাকগুলো। এখন সবই প্রায় ভস্ম। কিছু লুটপাটও হয়েছে। দগ্ধীভূত বাড়িটির ভেতর চোখে পড়ল ১৯৭০ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের কোনো নির্দেশনা লেখা টাইপ করা কাগজের ছেঁড়া পাতার টুকরো অংশ।

১৯৮১ সালে বঙ্গবন্ধুর বড় মেয়ে শেখ হাসিনার কাছে বাড়িটি আবার হস্তান্তর করা হয়। বাড়িটিকে তিনি জাদুঘরে রূপান্তরের জন্য বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের কাছে হস্তান্তর করেন। এর নাম হয় 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর'। মূল বাড়িটির পেছনে জাদুঘরের জন্য ছয়তলা আরেকটি ভবনও তৈরি করা হয়। জাদুঘরের উদ্বোধন হয় ২০১১ সালে।

জাদুঘরের সহকারী কিউরেটর কাজি আফরিন জাহান ২০০৬ সাল থেকে এ জাদুঘরের সঙ্গে জড়িত। তিনি জানান, জাদুঘরের ১০ হাজারের বেশি নিদর্শনের সবই ভস্মীভূত হয়ে গেছে।

বুলেটের দাগে আগুন ঃ এ বাড়ির বাইরে ধানমন্ডি লেকের ধার ঘেঁষে উন্মুক্ত চত্বর। সেখানে ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল। সেটি এখন অন্তর্হিত। বাড়ির প্রবেশপথে নিচতলায় ছিল আরেকটি ম্যুরাল। সেটির মুখ বিনষ্ট।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে বাড়িটির দোতলার সিঁড়িতে বুলেটের আঘাতে লুটিয়ে পড়েছিলেন শেখ মুজিব। দেয়ালে সেই বুলেটগুলোর চিহ্ন ছিল কাচ দিয়ে আবৃত। কাচ ভেঙে সেসব দাগ এখন উন্মুক্ত।

১৯৮১ সালে বাড়িটি ফিরে পাওয়ার সময়ও দোতলার সিঁড়িতে ছিল শেখ মুজিবের রক্তের দাগ। সে দাগ অক্ষুণ্ন ছিল এতগুলো বছর ধরে। এবারের আগুন মুছে দিয়েছে সেই রক্তচিহ্ন। একই আগুনে পুড়ে গেছে বাড়িটির সঙ্গে আমাদের ইতিহাসের বহু স্মারক।

প্রথম আলো, ঢাকা, ১৫ আগস্ট, ২০২৪।

বাংলাদেশ ঃ সারা দেশে দেড় হাজার ভাস্কর্য ও ম্যুরাল ভাঙচুর

প্রথম আলো,১৯ আগস্ট, ঢাকা, নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর রাজধানীসহ সারা দেশে প্রায় দেড় হাজার ভাস্কর্য, রিলিফ ভাস্কর্য, ম্যুরাল ও স্মৃতিস্তম্ভ ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও উপড়ে ফেলা হয়েছে। এসব ভাস্কর্য ও ম্যুরালের বেশির ভাগই ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের, স্বাধীনতাসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক। ধ্বংস করা হয়েছে ময়মনসিংহের শশীলজের ভেনাসের মূর্তি, সুপ্রিম কোর্টের থেমিস ও শিশু একাডেমির দুরন্ত ভাস্কর্যটিও।

প্রথম আলোর প্রতিনিধিরা খোঁজ নিয়ে ৫ থেকে ১৪

আগস্টের মধ্যে ৫৯টি জেলায় ১ হাজার ৪৯৪টি ভাস্কর্য, রিলিফ ভাস্কর্য (সিরামিক বা টেরাকোটা দিয়ে দেয়ালে খোদাই করে ফুটিয়ে তোলা অবয়ব), ম্যুরাল ও স্মৃতিস্তম্ভ ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও উপড়ে ফেলার তথ্য পেয়েছেন। বেশির ভাগ ভাঙচুর ও আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটেছে ৫, ৬ ও ৭ আগস্ট।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল ভাঙচুর ঃ ১৫ আগস্ট ২০২৪

আমি খুবই দুঃখিত, ভারাক্রান্ত। এমন না হওয়াই উচিত ছিল। আর যেন এমন ঘটনা না ঘটে। প্রত্যাশা করি দ্রুত সংস্কারকাজ শুরু হবে-হামিদুজ্জামান খান, ভাস্কর্যশিল্পী।

ঢাকা মহানগর এলাকার ১৫টি স্থানে ১২২টির বেশি ভাস্কর্য, ম্যুরাল ও রিলিফ ভাস্কর্য ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও উপড়ে ফেলা হয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমানের পরিপূর্ণ অবয়ব কাঠামোর ভাস্কর্য ধ্বংস করা হয়েছে ৭টি। ঢাকা বিভাগে ২৭৩টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ২০৪, রাজশাহীতে ১৬৬, খুলনায় ৪৭৯, বরিশালে ১০০, রংপুরে ১২৯, সিলেটে ৪৯ ও ময়মনসিংহ বিভাগে ৯২টিসহ মোট ১ হাজার ৪৯২টি ভাস্কর্য, রিলিফ ভাস্কর্য, ম্যুরাল ও স্মৃতিস্তম্ভ ভেঙে, উপড়ে ফেলে এবং আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

ভাস্কর্য, ম্যুরাল ভাঙচুর প্রসঙ্গে দেশের প্রথিতযশা ভাস্কর্যশিল্পী হামিদুজ্জামান খান প্রথম আলোকে বলেন, 'আমি খুবই দুঃখিত, ভারাক্রান্ত। এমন না হওয়াই উচিত ছিল। আর যেন এমন ঘটনা না ঘটে। প্রত্যাশা করি দ্রুত সংস্কারকাজ শুরু হবে।'

নাচোলে ম্যুরাল ভাঙচুর করল দুর্বৃত্তরা ঃ ০৯ আগস্ট ২০২৪
ঢাকার যত ভাস্কর্য

'স্বাধীনতা সংগ্রাম' নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার ভাস্কর্যগুলো ভাঙচুর করা হয় ।
ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িতে হামলা,ভাঙচুরের সময় ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে দুটি বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল। রাজধানীতে ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত পাঁচটি ভাস্কর্যের স্থান ঘুরে দেখা গেছে, কোথাও হাতুড়ি-শাবল দিয়ে পুরোপুরি ধ্বংস করা হয়েছে, কোথাও উপড়ে ফেলা হয়েছে, কোনো কোনো ভাস্কর্য পোড়ানো হয়েছে আগুনে।

মুক্তিযোদ্ধা, শিল্পী শামীম শিকদারের 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' ভাস্কর্যটি রাজধানীর পলাশীর মোড়ে অবস্থিত। সেখানে ছোট-বড় শতাধিক পৃথক ভাস্কর্য রয়েছে। এর মধ্যে অক্ষত আছে মাত্র পাঁচটি। বাকিগুলো উপড়ে ফেলা হয়েছে। ১১ আগস্ট দুপুরে সরেজমিনে দেখা যায়, মাটিতে লুটাচ্ছে দেশ-বিদেশের কবি, সাহিত্যিক, বিপ্লবী, রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞানীদের আবক্ষ ভাস্কর্য। এর মধ্যে আছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে ইয়াসির আরাফাত, জগদীশচন্দ্র বসু থেকে লালন।

শিশু একাডেমি চত্বরের 'দুরন্ত' পুড়ে যাওয়ার খবর জানা গেছে ৮ আগস্ট। সেদিন বিকেলে শিশু একাডেমিতে গিয়ে দেখা যায়, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পড়ে আছে দুরন্তর অঙ্গার শরীর। অক্ষত ছিল শুধু শিশু মুখটুকু। কাঠি দিয়ে চাকা নিয়ে ছুটে চলা কিশোরের দুরন্ত ভাস্কর্যটি স্থাপন করা হয়েছিল ২০০৮ সালে। পাশে থাকা শেখ রাসেলের ম্যুরালটিও পুড়ে ছাই।

বিজয় সরণিতে শেখ মুজিবুর রহমানের 'মৃত্যুঞ্জয়' ভাস্কর্য স্থাপিত হয় সাম্প্রতিক সময়ে। গত বছরের ১০ নভেম্বর 'মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাঙ্গণ' উদ্বোধন করা হয়। ৫ আগস্ট বিকেলে দেখা যায়, বিজয় সরণিতে বিশাল অবয়বের ভাস্কর্যটি ভাঙার চেষ্টা চলছে। দড়ি বেঁধে টেনে, আগুন দিয়ে, শাবল চালিয়ে একপর্যায়ে ধ্বংস করা হয় মৃত্যুঞ্জয়।

সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বর্ধিত ভবনের সামনে স্থাপিত থেমিসের ভাস্কর্যটি উপড়ে ফেলা হয়েছে দুই পর্বে। এই ভাস্কর্য নিয়ে ২০১৬ সাল থেকেই ছিল নানা মতবিরোধ। গ্রিক দেবী থেমিসের আদলে ন্যায়বিচারের প্রতীক হিসেবে গড়ে তোলা এই ভাস্কর্যের হাতে ছিল ন্যায়দণ্ডের প্রতীক। ৭ আগস্ট উপড়ে ফেলা হয় এটি।

ময়মনসিংহে ভাঙা হলো শশীলজের ভেনাসের ভাস্কর্য ঃ ০৭ আগস্ট ২০২৪

ময়মনসিংহের শশীলজে থাকা ভেনাসের ভাস্কর্যটি ভাঙা হয়েছে, চুরি হয়েছে মাথাটি। শশীলজের জাদুঘরের তত্ত্বাবধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন প্রথম আলোকে বলেছেন, 'শত শত লোক দলবেঁধে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। ভাস্কর্যের মাথার অংশ পাওয়া যায়নি। এটি অমূল্য সম্পদ ছিল।' এ শহরে জয়নুল সংগ্রহশালার সামনে থাকা শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আবক্ষ মূর্তিটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অবশ্য স্থানীয় শিল্পীরা মিলে পরে সেটি সংস্কার করেছেন।

খুলনায় শেখ মুজিবুর রহমানের দুটি ভাস্কর্য পুরোপুরি ভেঙে ফেলা হয়েছে।খুলনার নিকটে ১৯৭১ সালে খান সেনাদের দ্বারা রাজাকারদের সহায়তায় কুখ্যাত ' চুকনগরের ' গণহত্যা সংগঠিত হয়েছিল। নদী নালা পেরিয়ে হাসনাবাদ বর্ডারের কাছে প্রায় ১০ হাজার শরণার্থী বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। বর্ডার তো এসেই গেছে। খান সেনারা এসে ব্রাশ ফায়ার করে

কয়েক হাজার মানুষকে হত্যা করে। খুলনাতে ওই নারকীয় হত্যার স্মরণে একটি মিউজিয়াম হয়। সেটি এবার পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

জেলা শহর মাদারীপুরে নির্মাণাধীন মুক্তিযুদ্ধের একটি স্মৃতিকেন্দ্রের নাম ছিল 'পলাশী থেকে ধানমন্ডি'। শহরের প্রাণকেন্দ্র শকুনির লেকপাড়ে অবস্থিত এই স্মারকের ভেতরের সবকিছু নষ্ট করা হয়েছে ৭ আগস্ট বিকেলে।

জেলায় জেলায় ক্ষতি ঃ

মেহেরপুরের মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সের ভাস্কর্যগুলো ভাঙচুর করা হয় মেহেরপুরের 'মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স 'কে একক ভাস্কর্য হিসেবে ধরা হলেও সেখানে পাঁচ শতাধিক পৃথক ভাস্কর্য ছিল। কমপ্লেক্সের অন্তত ৩০৩টি ছোট,বড় ভাস্কর্য ভাঙচুর করা হয়েছে। সবার আগে ভাঙা হয় বঙ্গবন্ধুর বিশাল ভাস্কর্যটি। ৫ আগস্ট বিকেল পাঁচটার দিকে শতাধিক যুবক রড, বাঁশ ও হাতুড়ি নিয়ে স্মৃতি কমপ্লেক্সে প্রবেশ করে। প্রথমে তারা বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যটির মাথা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। একই সময় এলোপাতাড়িভাবে আঘাত করে '১৭ এপ্রিলের গার্ড অব অনার' ভাস্কর্যটিতে।

ময়মনসিংহের শশীলজ জাদু ঘরের ভেনাসের মূর্তিটি ভেঙে ফেলা হয় । ৫ আগস্টের পর গাজীপুরে তিনটি স্থানে ভাস্কর্য ভাঙচুর করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সাত বীরশ্রেষ্ঠের রিলিফ ভাস্কর্য। এটি ছিল জয়দেবপুরের ভেতরের দিকে। সিলেটে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়, এমসি কলেজ, জেলা পরিষদ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থাকা ১২টির বেশি ম্যুরাল ভাঙা হয়েছে। নরসংদীতে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে 'তর্জনী' নামে পরিচিত ভাস্কর্যটি। সেখানে শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চ ভাষণের একটি আঙুল তুলে রাখা সেই দৃশ্যের অনুকরণে তর্জনী বানানো হয়েছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ভাস্কর্য বিভাগের চেয়ারম্যান নাসিমুল খবির প্রথম আলোকে বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত ভাস্কর্যের তালিকা প্রণয়নের কাজ চলছে। গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে সংস্কারের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে যাওয়া ভাস্কর্য নির্বাচনে। কোনটি কোন প্রক্রিয়ায় সংস্কার হবে তা নির্ধারণে বিশেষজ্ঞদের সম্পৃক্ততা প্রয়োজন। তবে সবগুলোই সংস্কার করা সম্ভব নয়।

প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার নিজস্ব প্রতিবেদক

স্মরণ ঃ 'চোখ'-এর স্রষ্টা উৎপলেন্দু চক্রবর্তী প্রয়াত

গত ২০ আগস্ট মঙ্গলবার বিকেলে প্রয়াত হলেন জাতীয় পুরস্কারজয়ী চলচ্চিত্র পরিচালক উৎপলেন্দু চক্রবর্তী। বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। রানীকুঠির সরকারি আবাসনে নিজের ঘরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। দিন কয়েক আগেও উৎপলেন্দু আবার ছবি তৈরির ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আশির দশকে 'ময়নাতদন্ত', 'চোখ', 'দেবশিশু'র মতো একাধিক পুরস্কারজয়ী ছবির পরিচালক উৎপলেন্দু। ১৯৮২ সালে 'চোখ' ছবিটি 'সেরা ছবি'র সম্মান জিতে নেয়। উৎপলেন্দুর ঝুলিতে আসে সেরা পরিচালকের পুরস্কার। 'চোখ' ছবিটির পোস্টার এঁকে দিয়েছিলেন স্বয়ং সত্যজিৎ রায়। এ ছাড়াও উৎপলেন্দুর ঝুলিতে রয়েছে অন্যান্য আরও পুরস্কার, স্বর্ণপদক। দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন উৎপলেন্দু। পড়ে গিয়ে ভেঙেছিল কোমরের হাড়। ছিল প্রস্টেটের সমস্যাও। মে মাসে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। যদিও প্রায় এক মাস পর বাড়ি ফিরে আসেন তিনি। এত যুদ্ধ করেও শেষরক্ষা হল না। উৎপলেন্দুর দুই মেয়ে ঋতাভরী ও চিত্রাঙ্গদাও সিনেমার সঙ্গে যুক্ত। স্ত্রী শতরূপা সান্যালও পরিচালক। যদিও উৎপলেন্দুর সঙ্গে দীর্ঘদিন যোগাযোগ নেই কারও।

প্রয়াত জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত পরিচালকের আরও একটি পরিচয় ছিল। সম্পর্কে তিনি ঋতাভরী চক্রবর্তীর বাবা। তবে বাবার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন না 'ফাটাফাটি' অভিনেত্রী, কারণ শহরে ছিলেন না তিনি। তবে শহরে থাকলেও আসতেন কি না তা নিয়েও প্রশ্ন থেকে যায়। কারণ বাবার সঙ্গে সম্পর্ক একেবারেই মধুর ছিল না ঋতাভরীর।

মা শতরূপা সান্যালের কাছেই বড় হয়েছেন দুই বোন চিত্রাঙ্গদা এবং ঋতাভরী। শোনা যায়, সেভাবে পিতৃস্নেহ কোনওদিন পাননি তিনি, তাই প্রয়াত পরিচালক উৎপলেন্দু চক্রবর্তীকে বাবা বলে পরিচয় দিতেন না ঋতাভরী চক্রবর্তী। তবে কয়েক ঘন্টা আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেছেন তিনি। সম্ভবত, এই মুহূর্তের জন্যই সেই পোস্ট। যদিও সরাসরি বাবার উদ্দেশ্যে বা বাবার নাম নিয়ে সেই পোস্টে কিছুই লেখেননি ঋতাভরী। ঋতাভরীর পোস্টের মানে খানিকটা এরকম, 'জীবনের বিভিন্ন খারাপ মুহূর্তে হয়তো অশান্ত হয়ে উঠি আমরা, জীবনের খারাপ পর্বে নিজের ভাগ্যকে দোষ দিয়ে থাকি আমরা, কিন্তু একটা সময় যখন সেই

পর্বের শেষ লগ্ন আসে তখন তা তোমাকে যেতে দিতেই হয়'।

বাবার সঙ্গে হয়তো খারাপ স্মৃতি বেশি ঋতাভরীর, শেষের দিকে নিজের বাবার পরিচয় দিতে চাইতেন না তিনি। কিন্তু সেই মানুষটার মৃত্যুর পর হয়তো তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা খারাপ স্মৃতি খানিকটা মলিন হয়ে যায় সময়ের নিয়মেই, তাই হয়তো এই ইঙ্গিতবাহী পোস্ট করে মনের কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন 'ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মোটি' ছবির নায়িকা। প্রসঙ্গত, এর আগে যখন গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন উৎপলেন্দু চক্রবর্তী তখনও সেই বিষয়ে কোনও কথা বলেননি ঋতাভরী। গতকাল উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর মৃত্যুর পর পরিচালক সুদেষ্ণা রায় ঋতাভরীর মা শতরূপা সান্যালের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। জানানো হয় এই মৃত্যুর খবর। তবে সম্ভবত উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর শেষকৃত্যে যোগ দেননি শতরূপা সান্যাল।

হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ রিপোর্ট ঃ সেবি ও আদানি দের আর্থিক জালিয়াতি

অমিতাভ সিংহ

অবশেষে সরকারী নথিতেও পাওয়া গেল বর্তমান সেবি চেয়ারপার্সন মাধবী পুরী বুচ শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সেবির পর্ষদ সদস্য হওয়ার পরেও আগোরা অ্যাডভাইজরিতেও নিজের অংশীদারিত্ব রেখে দিয়েছিলেন।

গত বছর আমেরিকার হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ মোদী ঘনিষ্ঠ আদানী গ্রুপের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ প্রতারণার অভিযোগ তুলে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। বিশ্বের বহু অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ এটিকে বিশ্বের সবথেকে বড় কর্পোরেট প্রতারণার তকমা দিয়েছিল।এরপর আদানীদের দশটি সংস্থা যথা আদানি গ্রীন,আদানি পাওয়ার,আদানি ট আদানি গ্যাস,আদানি ট্রান্সমিশন,আদানি এন্টারপ্রাইস,আদানি পোর্ট,আদানি উইলমার, অম্বুজা ও এসিসি সিমেন্ট এর শেয়ারের দাম প্রবলভাবে পড়ে যায়।

আদানিদের বিরুদ্ধে যে আর্থিক জালিয়াতির অভিযোগ ছিল তা মূলতঃ তাদের বিদেশী তহবিল ঘুরপথে সংস্থার শেয়ার দরকে বেআইনিভাবে বাড়িয়েছে এবং তার ফলে সাধারণ লগ্নীকারীদের কষ্টার্জিত অর্থের লোকসান হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে সেবির চেয়ারপার্সন ও তার স্বামী ধবল বুচের সেই সব অফসোর সংস্থায় অংশীদারি ছিল। অথচ সুপ্রীম কোর্টের আদেশে এই সেবিই আদানীদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে অধিকাংশ কেসে ক্লিনচিট দিয়ে দেয়। সেবি নাকি কোনও গুরুতর অনিয়ম খুঁজে পায় নি। আসলে এখন যা দিনের আলোয় প্রতিভাত তা হল যে দুটি অফসোর ফান্ড ব্যবহার করে বেআইনিভাবে শেয়ারের মালিকানা ও মূল্যের হেরফের করার অভিযোগ, সেখানে সেবি চেয়ারপার্সন খোদ মাধবী পুরী বুচের অংশীদারিত্ব ছিল যা স্বার্থের সংঘাত। এর ফলে এটাও পরিষ্কার হল সেবিতে মোদীর নিযুক্ত চেয়ারপার্সন নিজেই প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী গৌতম আদানির গ্রুপ অব কোম্পানির শেয়ার কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত। আগে যখন আদানিদের বিরুদ্ধে কারচুপি করে নিজেদের শেয়ারের দাম বাড়ানো হয় তখন শেয়ার বাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবি কেন ঠিকভাবে তদন্ত করে নি তার কারণও স্পষ্ট হল।

হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ তাদের রিপোর্টে বলে আদানিরা দুটি বিদেশী তহবিল বা ফান্ড গঠন করেছিল বারমুডা ও মরিশাসে। এই দুটি ফান্ডের টাকা আদানি গোষ্ঠীর শেয়ারে বিপুল লগ্নি করে শেয়ারের দরকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখায় ও সাধারণ লগ্নীকারীদের লগ্নি করতে প্রলুব্ধ করে । আসল দামের থেকে অনেক বেশী দামে লগ্নীকারীরা তা কেনে।পরে এই দাম যখন নিজ অবস্থায় ফিরে আসে তখন সাধারণ মানুষের টাকা অনেকটাই আদানিদের পকেটে। পাঠকগন, পরশুরামের শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড গল্পটি যারা পড়েছেন তার সঙ্গে এই জালিয়াতির মিল খুঁজে পাচ্ছেন কি? এই দুটি কুখ্যাত তহবিলের মালিকানার অংশীদার ছিলেন এই মাধবী পুরী বুচ ও তার স্বামী ধবল বুচ যা প্রকাশ্যে আসতেই মোদীকে সংসদের বাদল অধিবেশন আচমকা শেষ করে দিতে হল? কংগ্রেসসহ বিরোধীরা জেপিসি বা যৌথ সংসদীয় কমিটিকে দিয়ে তদন্তের দাবী করেছেন। লেকসভায় বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধী প্রশ্ন তুলেছেন কেন মোদী সরকার যৌথ সংসদীয় কমিটিকে দিয়ে তদন্তের ভয় পাচ্ছেন? এতে কি তার নিজেরও কোন স্বার্থ আছে? এই তথ্য সামনে আসার পর শেয়ার বাজারের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে মানুষের মনে যে সন্দেহের বাতাবরণ তৈরী হবে, তার ফলে দেশের অর্থনীতিতে শুধু প্রভাব পড়বে তাই নয় লগ্নীকারীদের যে লোকসান হবে তার দায় কে নেবে,প্রধানমন্ত্রী নিশ্চই তা নেবেন না। তিনি আরও বলেন যার কাঁধে শেয়ার বাজারে লগ্নিকারী সাধারণ মানুষদের স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব সেই সেবির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেছে। কারণ সেবির কর্ণধারের বিরুদ্ধেই শেয়ার কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। তিনি এটাও বলেন মোদী সরকারের কাছে সাধারণ লগ্নীকারীদের প্রশ্ন কেন এখনও মাধবী পুরী বুচ ইস্তফা দেননি। গত বছর যখন এই কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে এল তখন তৃণমূল ভিন্ন অবস্থান নিয়েছিল

জেপিসি তদন্তের বিষয়ে। তখন অবশ্য মোদীকে ক্রাচে ভর দিয়ে চলতে হত না তাই তার বিরুদ্ধে কথা বলতে একটু দ্বিধাবোধ তো ছিলই। তবে এবারে তৃণমূলও জেপিসি চাইছে।এই ঘটনা সামনে আসতেই বিজেপি রে রে করে উঠেছে। কংগ্রেসের প্রশ্ন, অভিযোগ তো সেবির চেয়ারপার্সন ও আদানি গোষ্ঠীর দেশের মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করার বিরুদ্ধে। তা নিয়ে বিজেপি নেতারা স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মত লাফাচ্ছেন কেন? তাহলে কি ধরে নিতে হবে মাধবী পুরীর নিয়োগের পেছনে গৌতম আদানির হাত ছিল? আদানিদের বিরুদ্ধে কিছু বললেই কেন বিজেপির মন্ত্রী,সাংসদ বা নেতারা তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠেন?

অবশেষে বুচ দম্পতি এই দুটি অফসোর ফান্ডে লগ্নি থাকার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন।এখন প্রশ্ন যে সেবি যা বাজারকে নিয়ন্ত্রন করে তার কর্ণধার থেকে কি করে নিজের উপদেষ্টা সংস্থা চালালেন? হিন্ডেনবার্গের এই নতুন তথ্যটি সামনে আসার পর এমাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আবার আদানি গোষ্ঠীর ১০ টির মধ্য ৮ টি কোম্পানির শেয়ারের দাম পড়ে যায় ও লগ্নিকারীরা বিপুল লোকসান করে। তার পরিমান ২২০৬৪ কোটি টাকা।পূর্বে বুচ দম্পতির দাবী ছিল স্বার্থের সংঘাতের আগেই অর্থাৎ মাধবী সেবিতে সদস্য নিয়োগ হওয়ার(২০১৭) আগেই সেটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।তা যে মিথ্যা তার প্রমাণ মাধবীর পরবর্তী বিবৃতি, তা হল তার নামে থাকা শেয়ার তার স্বামী ধবলের নামে ট্রান্সফার করে দিয়েছেন। হিন্ডেনবার্গ দাবী করেছে বরমুডা ও মরিসাসে যে অস্বচ্ছ তহবিলে বুচ দম্পতির লগ্নি ছিল তাতে রাখা ছিল গৌতম আদানির ভাই বিনোদ আদানির সরানো টাকা। এই তহবিল পরিচালনা করত ধবলের বাল্যবন্ধু,দ আবার আদানিদের কোম্পানির ডিরেক্টর। ২০১৭ থেকে ২০২২ পর্যন্ত সেবির পূর্ণ সদস্য থাকার সময় সিঙ্গাপুরের সংস্থার ১০০ শেয়ার ছিল মাধবীর হাতে। এই দম্পতি ১৫ জুন ২০১৫ সালে আইপিই প্লাস ফান্ড নামে তহবিলটি খোলেন। মাধবী যুক্তি দিয়েছেন যে এই দুটি সংস্থার শেয়ার তিনি ধবলের নামে করে দিয়েছেন। যদিও গত ৩১ মার্চের তারিখের নথি থেকে পরিষ্কার আগোরা অ্যাডভাইজরি (ইন্ডিয়া) তে তার ৯৯ শেয়ার রয়েছে, তার স্বামীর নয়। মাধবী সেবির চেয়ারপার্সন হওয়ার পরেও সংস্থাটি উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করে চলেছেন ও গত তিন বছর সংস্থাটির আয় প্রায় আড়াই কোটি টাকা। সব মিলিয়ে গত আট বছরে প্রায় ৪ কোটি টাকা আয় করে সংস্থাটি। ২০০৮ সালের সেবির নিয়ম অনুযায়ী সেবির কোন সদস্য ই তারা কোন লাভজনক সংস্থায় কাজ করতে, বেতন বা ফি নিতে বা অন্য কোন সুবিধা নিতে পারবেন না। কিন্তু সেবির চেয়ারপার্সন সেই নিয়ম ভাঙা সত্বেও মোদী সরকার তাকে পদত্যাগ করতে বলতে পারছেন না

তার কারণ কি গৌতম আদানি? এই অংশীদারিত্ব নিয়ে কোন তথ্য যে মাধবী সরকার বা সেবিকে জানান নি তা দুজন পর্ষদ সদস্যের বক্তব্যে পরিষ্কার।অন্যতম সদস্য ও প্রাক্তন আমলা সুভাষচন্দ্র গর্গ জানিয়েছেন যে মাধবী বা কোন আধিকারিকের তরফে পর্ষদে কোন কথা হয়নি। যদিও মাধবী তা জানালে সেবির তরফে কোনভাবেই অনুমতি মিলত তা বলাই বাহুল্য। এর ফলে বাজার নিয়ন্ত্রক হিসাবে মাধবীর অবস্থান এক বড়রকমের প্রশ্নের মুখে পড়তে বাধ্য।

আবার হুইসেল ব্লোয়ারের প্রাপ্ত নথিগুলি থেকে বোঝা যায় আদানি র টাকা সিফোনিং কেলেঙ্কারিতে ব্যবহার করা হয়েছিল অফসোর কোম্পানির মাধ্যমে। এই কোম্পানিতে সেবি চেয়ারপার্সনের শেয়ার ছিল। তার স্বামী ধবল বুচ ২০১৯ সালে ব্ল্যাকস্টোন কোম্পানির সিনিয়র অ্যাডভাইজার হিসাবে যোগ দেন ধবল, তখন মাধবী সেবির সদস্য।এই সময়ে সেবি আরইআইটি (রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট) নিয়মে ব্যাপক পরিবর্তন আনে। ব্ল্যাকস্টোনের কাজ হল জমি,আবাসন,আরইআইটিতে লগ্নী করা। আশা করি ঘোটালাটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না।

২০০৯ সালে সত্যম কেলেঙ্কারি প্রকাশ পেয়েছিল। সংস্থার চেয়ারম্যান ও সিইও রামলিঙ্গম রাজু সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করেছিলেন। সেবি আদানি যোগের পর সেবি চেয়ারপার্সন মাধবী প্রতিদিনই মিথ্যাচার করে যাচ্ছেন।পদত্যাগ করা তো দূরের কথা। সরকারও তাকে বাঁচাবার আপ্রামনি ওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই কেলেঙ্কারির ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক,অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান,এলআইসি ইত্যাদি সংস্থার ওপর প্রবল প্রভাব পড়বে।কারণ সরকারী নির্দেশে এদের বিশাল লগ্নি আছে আদানীদের সংস্থাগুলিতে। এই ব্যাঙ্ক বা এলআইসিতে সাধারণ মানুষের অর্থ রাখা আছে।স্বভাবতই এরা দূর্বল হলে দেশের মানুষ অসুবিধায় পড়বেন ও দেশের অর্থনীতিতে এর প্রভাব পড়বে।তাই এই ঘোটা।লার নিরপেক্ষ তদন্ত প্রয়োজন যা একমাত্র যৌথ সংসদীয় কমিটিই করতে পারবে।

প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে বাংলাদেশে বন্যা ঃ চলছে ভারত বিরোধী মিথ্যা প্রচার

সমগ্র অববাহিকা অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে বয়ে আসা বিশাল পরিমাণ জলরাশির কারণে বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের ১০ টি জেলা বন্যা কবলিত হয়েছে। কিন্তু এই বন্যার জন্য ভারতকে দায়ী করে বাংলাদেশের কিছু সরকারি কর্মকর্তা অসত্য ও বেলাগাম মন্তব্য করে চলেছেন। গত বুধবার ২১ আগস্ট থেকেই এই মিথ্যা প্রচার শুরু হয়েছে। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একজন সমন্বয়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন 'রাষ্ট্র সংস্কারের সময় এই বন্যা একটি আন্তর্জাতিক চক্রান্ত।' তিনি আরো বলেন 'আমাদের যখন পানির প্রয়োজন,আপনারা তখন পানি দেন না। যখন পানির প্রয়োজন নেই তখন বাঁধ খুলে দিয়ে বাংলাদেশের মানুষকে বিপদে ফেলছেন।' আর এক সমন্বয়ক ও সরকারের তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বলেছেন , 'আগাম সতর্কতা ছাড়া ভারত বাঁধ খুলে দিয়ে অমানবিকতার পরিচয় দিয়েছে এবং বাংলাদেশের সঙ্গে অসহযোগিয়া করেছে ।' বাংলাদেশে বন্যা পরিস্থিতির জন্য ভারত দায়ী এই মর্মে বহু বাংলাদেশী সমাজমধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

এই পরিস্থিতিতে ঢাকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত প্রণয় বর্মা বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি উত্থাপন করেন। মহম্মদ ইউনূস ভারতীয় রাষ্ট্রদূত কে বলেন ' বাংলাদেশের বন্যা নিয়ে যা প্রচার হচ্ছে তা দুঃখজনক।'

এদিকে বাংলাদেশের দুর্যোগ ও ত্রাণ বিষয়ক উপদেষ্টা ফারুক ই আজম গত ২২ তারিখ বলেন , 'ভারত ডুম্বুর বাঁধ খুলে দেওয়ার ফলে বাংলাদেশে বন্যা হয়েছে, এমন কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য বাংলাদেশ সরকারের কাছে নেই।' তিনি বলেন 'প্রবল বৃষ্টিপাত ও জলের প্রবাহের বিষয় টি প্রাকৃতিক। আর ভারতেও তো বন্যা হয়েছে।'

বাংলা দেশের পশ্চিম দিক থেকে ঠান্ডা বাতাস দেশের পূর্বাঞ্চলের আকাশে প্রবেশ করে। অন্যদিকে বঙ্গোপসাগর থেকে আসা লঘুচাপ কক্সবাজার-চট্টগ্রাম হয়ে কুমিল্লা - নোয়াখালীর সীমানায় চলে আসে। আর মৌসুমি বায়ুও এ সময় শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই তিন মিলে বিপুল পরিমাণ মেঘ কুমিল্লা-নোয়াখালীর আকাশে স্তরে স্তরে জমা হয়। একসময় তা বিস্ফোরিত হয়ে জনপদে নেমে আসে। আবহাওয়াবিদেরা এটাকে বলছেন মেঘ বিস্ফোরণ বা 'ক্লাউড ব্লাস্ট'।

এই মেঘ বিস্ফোরণের শুরু ১৯ আগস্ট সকালে। এরপর টানা তিন দিন প্রবল বর্ষণ আর উজান থেকে আসা ঢল দেশের পূর্বাঞ্চলকে বিপর্যস্ত করে ফেলে। মেঘ বিস্ফোরণ বিস্তৃত ছিল ভারতের ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশের কুমিল্লা-ফেনীর ৫০ থেকে ৭০ কিলোমিটার পর্যন্ত। ১৯, ২০ ও ২১ আগস্ট এ এলাকায় অতিভারী বৃষ্টি হয়েছে।

ফেনী-নোয়াখালী-কুমিল্লা ঃ ১৯ থেকে ২২ আগস্ট;চার দিনে শুধু ফেনীতে ৪৩৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। একই সময়ে কুমিল্লায় বৃষ্টি হয়েছে ৫৫৭ মিলিমিটারের বেশি। নোয়াখালীতে হয়েছে ৬০৫ মিলিমিটার বৃষ্টি।

আবহাওয়াবিদ বজলুর রশিদ প্রথম আলোকে বলেন, বঙ্গোপসাগরের লঘুচাপটি ১৬ আগস্ট বাংলাদেশের ভূখণ্ডে উঠে আসে। তা সুস্পষ্ট লঘুচাপে পরিণত হয়ে প্রচুর মেঘ নিয়ে আসে। অন্যদিকে একই সময়ে পশ্চিমা বায়ু ঠান্ডা বাতাস নিয়ে আসে। সাগর থেকে আসা উষ্ণ মেঘ আর পশ্চিম দিক থেকে ঠান্ডা বাতাসের মিশ্রণে দেশের অভ্যন্তরে প্রচুর মেঘ হতে থাকে। ভূ-উপরিস্থ চাপের কারণে ওই মেঘ ফেনী, নোয়াখালী ও ভারতের ত্রিপুরার ওপর দীর্ঘ সময় ধরে স্থায়ী থাকার পর মেঘ বিস্ফোরণ ঘটেছে। ফলে অল্প সময়ে দু-তিন দিন ধরে প্রচুর বৃষ্টি হয়।

ডম্বুর বাঁধে কী হয়েছে? ঃ এই বন্যায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যেসব জেলা, তার মধ্যে আছে গোমতী। গোমতী জেলাতেই গোমতী নদীর ওপর ত্রিপুরায় ডম্বুর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্লুইস গেট সোমবার ১৯ আগস্ট খুলে দেওয়ার ফলে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যাপক বন্যা হয়েছে বলে বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে খবর বেরিয়েছে।ত্রিপুরা রাজ্যের বিদ্যুৎ দফতরের অধীন ওই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি।

দফতরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, যে প্রচারটা করা হচ্ছে ডম্বুর গেট খুলে দেওয়া নিয়ে, সেটা অপপ্রচার ছাড়া কিছু না।

গোমতী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কোনও গেট খুলে দেওয়া হয়নি। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জলাধারটির সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতা ৯৪ মিটার। জলস্তর এর বেশি উঠলেই নিজের থেকেই জল গেট দিয়ে বেরিয়ে যাবে। জলস্তর আবার নিচে নেমে গেলে নিজের থেকেই গেট বন্ধ হয়ে যাবে। জলস্তর সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতার বেশি হয়ে যেতেই জলাধারের দুটি গেট দিয়ে জল বেরোচ্ছে। এর মধ্যে একটি গেট দিয়ে ৫০% হারে জল বেরোচ্ছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষকে আগে থেকেই মাইকিং করে সতর্ক থাকার অনুরোধও জানানো হয়েছিল,দ বিবিসিকে বলেছেন রতন লাল নাথ।তিনি আরও বলেছেন যে গত তিন

দশকে এরকম বন্যা হয়নি ত্রিপুরায়। তাঁর কথায়, ১৯৯৩ সালের ২১শে অগাস্ট ত্রিপুরার সাব্রুমে একদিনে ২৪৭ মিলিমিটার বৃষ্টির রেকর্ড ছিল। আর এ বছর ২০শে অগাস্ট একদিনে বৃষ্টি হয়েছে ৩৭৫.৮ মিলিমিটার। ঠিক ৩১ বছর পরে একদিনে এত বেশি বৃষ্টি হয়েছে। পুরো মাসের হিসাব যদি দেখি, অগাস্ট মাসের ২১ দিনে স্বাভাবিক বৃষ্টি হওয়ার কথা ছিল ২১৪ মিলিমিটার। সেখানে বৃষ্টিপাত হয়েছে ৫৩৮. ৭ মিলিমিটার, অর্থাৎ ১৫১ %বেশি।

মন্ত্রী বলছিলেন, স্বাভাবিকভাবেই এত বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ায় এত বড় বন্যা দেখা গেছে তিন দশকেরও বেশি সময় পরে। সেই ১৯৯৩ সালে ডম্বুর জলাধারের গেট উপছিয়ে জল বেরিয়ে গিয়েছিল,আবার একই ঘটনা হলো ২০২৪ সালের অগাস্টে।

ডম্বুর বাঁধের অতিরিক্ত জলের কারনে ফেনীতে বন্যা হয় নি ? না, ডম্বুর বাঁধের সাথে ফেনীর কোন সংযোগ নেই। কিন্তু কিভাবে? নিজ দেশের ভৌগলিক অবস্থানটা অন্তত আমাদের সবার জানা উচিৎ।

ডম্বুর বাঁধের অতিরিক্ত জলের কারণে ফেনীর মুহুরী নদীতে বন্যা হচ্ছে না। কারণ, ডম্বুর বাঁধের অবস্থান ত্রিপুরার গোমতী নদীর উপরে। অর্থাৎ, বাঁধের অতিরিক্ত জলের কারনে ডম্বুর লেকের জল গোমতী নদী দিয়ে ত্রিপুরার ভিতর দিয়ে কুমিল্লায় প্রবেশ করে দেবীদ্বার, মুরাদনগর, দাউদকান্দি হয়ে মেঘনা নদীতে পড়বে। ফেনী নদী বা মুহুরী নদীর সাথে এই গোমতী নদীর কোনো সংযোগ নাই। তাই ডম্বুর বাঁধ ফেনীর বন্যা পরিস্থিতির উপর ভৌগলিকভাবেই কোনো প্রভাব ফেলেনি।

তাহলে ফেনীতে বন্যা কেন হচ্ছে? ঃ বন্যা হওয়ার কারণ বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট লঘুচাপ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করায় বাংলাদেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে এবং ভারতের ত্রিপুরায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হয়। বাংলাদেশের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের প্রদত্ত স্ট্যাটিস্টিক্স অনুসারে গত ১৯ আগস্ট ফেনীর পরশুরামে ৩০৪ মিলিমিটার, খাগড়াছড়ির রামগড়ে ১৪৫ মিলিমিটার, নোয়াখালীতে ১৫৪ মিলিমিটার, কুমিল্লায় ২১০ মিলিমিটার, মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় ২৩৮ মিলিমিটার, কামালগঞ্জে ১৬৩ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়। একইসাথে ত্রিপুরার আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী গত ১৯ আগস্ট ফেনীর সীমান্তবর্তী দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বগাফায় সর্বোচ্চ ৩৭৫ মিলিমিটার ও বিলোনিয়ায় ৩২৪ মিলিমিটার এবং গোমতী জেলার অমরপুরে ৩০৭ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

এই অতিভারী বৃষ্টিপাত গতকাল ২১আগস্ট অব্যাহত ছিলো, আজ এবং আগামীকালও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৬০ ঘণ্টা অবিরাম বৃষ্টিপাত হয়েছে। ফলে ত্রিপুরায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, বন্যার জল নদী দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। এদিকে বাংলাদেশের ফেনীতে টানা ভারী বর্ষণ এর সাথে পাহাড়ি ঢালে মুহুরী ও ফেনী নদীর জল বাড়ার ফলে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। পাহাড়ি ঢালে খাগড়াছড়ি শহর প্লাবিত হয়েছে। কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে ডাকাতিয়া নদীর জলও বেড়ে এলাকা প্লাবিত করেছে। তবে চৌদ্দগ্রামে পাহাড়ি ঢাল নয় বরং জলাবদ্ধতার কারণে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, নোয়াখালীতেও একই অবস্থা। সেখানে খাল-নদী ভরাট হয়ে যাওয়ায় ভারী বর্ষণের জল নিষ্কাশিত হতে না পারায় জলমগ্ন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

দক্ষিণের মুহুরী ও ফেনী নদীর পর উত্তরের সোনাই, ধলাই, খোয়াই, মনু নদীর জল বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। ফলে সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলা জল কবলিত হচ্ছে। এছাড়া কুমিল্লার গোমতী নদীর জলস্ফীতি অব্যাহত আছে, গতকাল (২১ আগস্ট ২০২৪) দুপুর ৩টায় কুমিল্লা পয়েন্টে গোমতী নদীর জল বিপদসীমা অতিক্রম করেছে।

ডম্বুর বাঁধ থেকে কুমিল্লা শহর পর্যন্ত গোমতী নদীর গতিপথ এবং গোমতী নদীর বেসিন এলাকা রয়েছে। মূলত ত্রিপুরার মধ্যাঞ্চল এলাকায় বৃষ্টিপাতের যত অতিরিক্ত জল তা গোমতি নদী হয়ে মেঘনা নদীতে গিয়ে পড়বে, ফেনী জেলা গোমতী নদীর বেসিনের বাইরে। সুতরাং ডম্বুর বাঁধের কারণে ফেনীর মুহুরী নদীতে বন্যা হচ্ছে-এই তথ্যটি সম্পূর্ণ ভুল।

বাঁধ খুলে দেওয়ার নাম তুলে ভারত বিরোধী সংগঠনগুলোকে তোল্লাই দেওয়া বন্ধ হোক।

পুনশ্চ ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের মোট ৫৪ টি নদী রয়েছে যা আমরা দুই দেশ সীমান্তরেখায় ভাগ করছি। তাতে যত বাঁধ দেওয়া আছে সমস্তটাই দুই দেশের বাই লেটারেল (দ্বি-পাক্ষিক) চুক্তি অনুযায়ী।